স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
২৪ এপ্রিল, ২০২১, ১১ বৈশাখ - ১৪২৮
৭৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচনে (বাঁ দিক থেকে) রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বিজয়, সুরেশ সোনী, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও বিজয় আঢ্য। ছবি : স্বপন পাল

নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠানে রামমোহন হলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ। ছবি : বাসুদেব পাল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

তৃণমূলের ইস্তাহার একটি পুস্তক মাত্র ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ১১

মোদী : এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ❑ তভলীন সিং ❑ ১৩

পুরুলিয়ায় বি পি এল কার্ডও বিক্রি হচ্ছে ❑ ১৯

নীরবে সন্ত্রাস সরবে বর্তমান ❑ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২০

নানা রঙের নববর্ষ ❑ নির্মল কর ❑ ২৪

জানকীবল্লভের পঞ্চরত্ন ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৪—২৫

নারী জাগরণের পথিকৃৎ জ্ঞানদানন্দিনী ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

স্মরণিকা : আমার ঠাকুর্দা প্রেমোৎপল বিশ্বাস ❑ বনান্তিকা বিশ্বাস ❑ ২৮

দিলীপ কুমার আঢ্য : সাধারণ কার্যকর্তা অসাধারণ কাজ ❑ দিলীপ কুমার ঘোষ ❑ ২৯

দুর্নীতির সর্দার ও সর্দারণী : পরিবর্তনের ঢেউ কি দিল্লীতে পৌঁছবে? ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

একলব্য ক্রীড়া প্রকল্প : বিকাশ ও উপলব্ধি ❑ শক্তিপদ ঠাকুর ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

গূঢ়পুরুষের কলম : ৮ ❑ **রাজ্য-রাজনীতি : ৯** ❑ **এইসময় : ১০** ❑
অন্যরকম : ১৮ ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

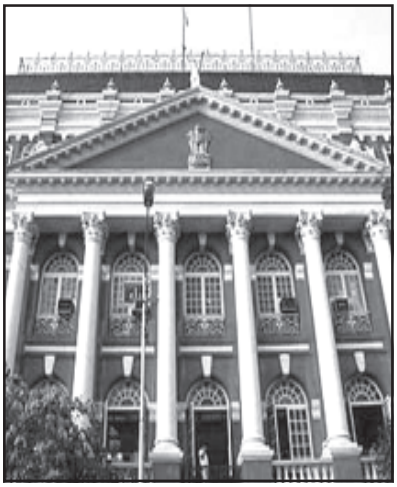

রাজ্যের মানুষ কেন পরিবর্তন চাইছে? — ১৪

৬৩ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১১ বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৫ এপ্রিল - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

সম্পাদকীয়

আন্না হাজারে, লোকপাল ও গণতন্ত্র

আমাদের দেশে ইদানীং একের পর এক যে দুর্নীতির ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে, তাহার মোড় ফিরাইবার জন্য জাতীয় জীবনে 'শক ট্রিটমেন্ট' বা নির্দয় আঘাত হানিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে এইরূপই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন প্রবীণ সমাজকর্মী দুর্নীতির বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া আমরণ অনশনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিয়াল্লিশ বছর ধরিয়া ঝুলিয়া থাকা লোকপাল বিলটি আইনে পরিণত করিবার দাবীতে তাঁহার এই অনশন সারাদেশ জুড়িয়া সমর্থিত হইয়াছিল। দুর্নীতির মতো পুরাতন ক্ষত চিকিৎসা করিবার দাবীতে এবং তাহাও একজন বৃদ্ধ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন—এই বিষয়ে বহু মানুষেরই সংশয় ছিল। কিন্তু তাহাদের ধারণা কতই না ভুল ছিল। বলিতে গেলে প্রায় রাতারাতি আন্না হাজারের মধ্য দিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার রুদ্ধ রোষ ফাটিয়া পড়িল। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে একটি গোপন বেদনার আর্তনাদ যেন গর্জন করিয়া উঠিল। নবীন-প্রবীণ, গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উপাসনা-পন্থ, জাত-পাত নির্বিশেষে দেশের মানুষ আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকারের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠিল। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যে ভাসমান দুর্নীতিকে নিমজ্জিত করিতে চাহিয়াছিল, তাহাই সুনামির রূপ গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া শ্রীহাজারের দাবী দ্রুত স্বীকার করা ব্যতীত অন্য পথ পায় নাই।

শ্রীহাজারের আহ্বান যে জনমানসের সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীতে সাড়া জাগাইয়াছিল তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গত কয়েক মাস ধরিয়া ইউপিএ সরকার একের পর এক দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হইতে ছিল। কমনওয়েলথ গেমস, আদর্শ বিল্ডিং সোসাইটি, সিভিসি নিযুক্তি হইতে শুরু করিয়া সর্বশেষে সব দুর্নীতির উৎস ২-জি টেলিকম কেলেঙ্কারি পর্যন্ত। দুর্নীতি সংক্রান্ত-বিষয়গুলির তদন্তের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভুদের পা-চাটা চামচা সিবিআই-এর মতো সংস্থাগুলিকে মনমোহন সিং সরকার নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। যাহা শেষ পর্যন্ত ইউপিএ সরকারকেই কলঙ্কিত করিয়াছে। শেষপর্যন্ত বিচার বিভাগকেই প্রশাসনের কাজকে নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করিবার জন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিতে হয়। সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে বস্তুত খুব কম সময়ই কাজ হইয়াছিল। সব কিছুই ঠিক চলিতেছে—এই বার্তা জনমানসে প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার তেমন বিরোধীদের জেপিসি গঠনের দাবীতে কর্ণপাত করে নাই। যদিও সরকারি ব্যবস্থা কার্যত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই রকম এক পরিস্থিতিতেই আন্না হাজারের আমরণ অনশনের ঘোষণা। এক যোগ্য ব্যক্তির যথাস্থানে যথাসময়ে এই ঘোষণা। সভ্য সমাজের যাঁহারা নিজেদের বিবেককে সরকারের কাছে বন্ধক রাখেন নাই—শ্রীহাজারে যেন তাহাদের শক্তির মূর্ত প্রতীক। যখন কোনও প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাজ করিতে ব্যর্থ হয়, তখন সেই ব্যর্থতার স্বরূপ জনতার সামনে উন্মোচিত কবিবার জন্য ব্যক্তিকেই আগাইয়া আসিতে হয়। ১৯৭৫ সালে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ যেমন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইবার শ্রীহাজারে সেই কাজটিই করিয়াছেন। আমাদের দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহাজারের এই কর্মপন্থাকে অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, রাজশক্তিকে লোকশক্তিই নিয়ন্ত্রিত করিবে—ইহাই আমাদের পরম্পরা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হইলে তাহার জবাব চাওয়ার অধিকার জনতার আছে। শ্রীহাজারে এই চেতনা জাগরণের অনুঘটক। সুতরাং তাঁহার ভূমিকাকে খাটো করিয়া না দেখিয়া তিনি যে বার্তা আমাদের দিতে চাহিয়াছেন, তাহার বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে। লোকপাল বিল হয়তো দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু ইহা যে দুর্নীতির রাহু থেকে কিছুটা হইলেও অব্যাহতি দেবে তাহা নিশ্চিত। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী গত ৩৫ বছরের মধ্যে সোনিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারই সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্ত। দেশের ৯২ শতাংশ মানুষই শ্রীহাজারের অবস্থানকে সঠিক বলিয়া মনে করে। দুর্নীতি যেখানে শাসকশ্রেণীর ধর্মে পরিণত হইয়াছে, লোকপাল বিল দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেখানে প্রথম পদক্ষেপ হইতে পারে। ভারতে গণতন্ত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনে নির্দয় হইয়া উঠিতে পারে। লোকশক্তি তাহার ক্ষমতার স্বাদ পাইয়াছে, রাজনীতিকরা সাবধান।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়। সকল দুঃখ সকল পাপের মূল অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়—এই সত্যটিই আত্মার আলোক। এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটি হচ্ছে ভারতের সত্য-পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি মন্ত্রের ভারতবর্ষে—সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান

পরিবর্তন দিশাহীন হলে বিপদ ডেকে আনবে : শ্রীসোনী

"পরিবর্তন সঠিক দিশায় (লক্ষ্যে) হলে সমস্যা থাকে না। আন্দোলন করলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে সেই পরিবর্তন দিশাহীন হলেই মুশকিল। তাতে বিপদ ডেকে আনবে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের পেছনে কিছু না কিছু বিচার্য থাকে। পৃথিবীর সবকটি পরিবর্তনের পেছনেই নির্দিষ্ট বিচারধারা রয়েছে।"

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘড়ির কাঁটা ছ'টা ছুঁই, ছুঁই। ১৪১৮ প্রাক্ নববর্ষের সন্ধ্যেয় কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এক মোহময় আবেশ—'ওরে নূতন যুগের ভোরে, দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।' একটু থমকে যেতে হলো। ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে স্বস্তিকা'র প্রকাশক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণ। যিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, স্বস্তিকাকে গ্রন্থাকারে নিয়ে এসে সংরক্ষণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস চলছে। যার প্রথম পদক্ষেপ হলো, নববর্ষ সংখ্যা থেকেই 'ম্যাগাজিন সাইজে' দ্রুত রূপান্তর ৬৩ বছর এক নাগাড়ে শাসক-বিরোধী কণ্ঠস্বরে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ শাসককুলকে উত্যক্ত করা পত্রিকাটির। এই কথাটিই আরও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হলো গত ১৪ এপ্রিল স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যা-র উন্মোচনে উপস্থিত হওয়া রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ তথা একজন প্রখ্যাত স্তম্ভলেখক ও শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয়ের ব্যাখ্যায়। তিনি মনে করেন, বর্তমান ভারতবর্ষের ৫টি মারাত্মক বিপদ যেমন—সীমান্ত সমস্যা, মাওবাদী, জেহাদী, উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বারেবারেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে স্বস্তিকা'র কলম। দীর্ঘদিন হিন্দী সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্যের সম্পাদক থাকার কারণে তরুণ বিজয়ের উপলব্ধি--- জাতীয়তাবাদী ভাব-ভাবনার ধারক-বাহক স্বস্তিকা। সেইসঙ্গে 'সাহস' ও 'হিম্মতে'র সঙ্গে স্বস্তিকার সংবাদ-সংগ্রহ ও তার উপস্থাপনাকেও কুর্নিশ করে গেলেন শ্রীবিজয়।

সম্ভাব্য নতুন যুগের ভোরে স্বস্তিকা'কে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে—এমনটাই মনে করছেন অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা তথা আর এস এসের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। কারণ তাঁর বক্তব্য—"পরিবর্তন সঠিক দিশায় (লক্ষ্যে) হলে সমস্যা থাকে না। আন্দোলন করলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে সেই পরিবর্তন দিশাহীন হলেই মুশকিল। তাতে বিপদ ডেকে আনবে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের পেছনে কিছু না কিছু বিচার্য থাকে। পৃথিবীর সবকটি পরিবর্তনের পেছনেই নির্দিষ্ট বিচারধারা রয়েছে। আন্দোলনের ফলে শান্তি না হিংসা আসবে? কোন্‌টি বেশি দরকার?" ভিড়ে ঠাসা সভাগৃহে উপস্থিত স্বস্তিকা'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের দিকে এহেন মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি নিদান দিয়ে গেলেন—শুধু এই সভাগৃহের মধ্যে কয়েক'শো মানুষকে নয়, তার বাইরে থাকা রাজ্যের লক্ষাধিক মানুষের কাছে—এই প্রশ্নগুলি সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষমতা একমাত্র স্বস্তিকা'রই রয়েছে।

তিনি আরও বললেন, হাজার বছর লড়াইয়ের পর যখন স্বাধীনতা পেলাম তখন ক্লান্ত। স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি। তাই সমস্যা সমাধানে আমাদের একাংশের—কম্যুনিস্টদের 'সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি' হলো মস্কো। সেকুলারিস্টদের হলো ইউরোপ। ফলে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও জটিল হলো। তাই "আজ সময় এসেছে নবজাগরণের। বাংলায় যত মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এসেছেন দর্শন, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে নব-উত্থানের বার্তা নিয়ে, নতুন ভারত নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়ে; ভারতীয় জীবনবোধ এবং পরম্পরাকে সম্মান জানিয়ে।" তরুণ বিজয়ের বক্তব্যে উঠে এল সেইসব নাম যাদের সার্ধ-শতবর্ষ কিংবা নিদেনপক্ষে শতবর্ষ সমারোহের বেড়াজালে ইতিমধ্যেই বেঁধে ফেলেছে বা বাঁধতে শুরু করেছে বঙ্গবাসী। যেমন ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, বিপিন চন্দ্র পাল, জগদীশ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে তাঁর বক্তব্যে সেই মোক্ষম কথাটিই উঠে এল যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যেভাবে নরেন্দ্রনাথকে আগামীদিনে ভাবী ভারতবর্ষের জন্য তৈরি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তাতেই মিলেছিল নবজাগরণের ঈপ্সিত ইঙ্গিত। তবে বাম-শাসনে এই মনীষীদের মনীষা রাজ্যবাসীকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে এমন একটা খেদের সুরও ছিল তাঁর কণ্ঠে। অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন আনন্দ পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিক ও কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, যিনি এককালে 'আমি ও ঘোড়া কর ভগবান' নামক একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেন পাঠক-সমাজে। ঠাকুরের সম্পর্কে একটি জরুরি মূল্যায়ন তিনি রাখলেন সভায়, 'মাঠপুকুর' কবিতার মাধ্যমে।

তরুণ বিজয় মনে করছেন, পাশ্চাত্য ভোগবাদী মানসিকতা যেভাবে পেজ-৩ সাংবাদিকতা, টাকা দিয়ে সংবাদ করানো (পেইড নিউজ) ইত্যাদিকে উস্কে দিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক শিকড়ে আঘাত হানছে তা রুখতে যেমন স্বস্তিকা-কে বঙ্গবাসীর একান্তই প্রয়োজন, তেমনই সাম্প্রদায়িক বিভাজন রুখতেও সৈনিকের ভূমিকায় দরকার 'স্বস্তিকা'-কে। সুরেশ সোনী বলছেন, বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলি স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তা না হয়ে আজ সারা বিশ্ব আর্থিক মন্দার (Global Recession) শিকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একদা মার্কিন নাগরিকদের আবাহন করে বলেছিলেন, যত খুশী ভোগ কর। উপভোগ করে দেশপ্রেমের পরীক্ষা দাও। আজ সেই দেশেরই প্রেসিডেন্ট ওবামা ভরতুকি

দিয়েও আমেরিকার বেকারত্ব ও মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি বিশ্বশান্তি (Global Peace) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সারা বিশ্ব এখন বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের শিকার। বৈশ্বিক পরিবেশগত ভারসাম্য (Global Ecological Balance) রক্ষার স্বার্থে ব্রাজিলের রিও এবং পরে কোপেনহেগেন-এ প্রমুখ রাষ্ট্রপ্রধানেরা সম্মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু সারা বিশ্বই এখন উষ্ণতার (Global Warming) শিকার। তীব্র ভোগবাদই এর মূলে। ভারতীয় দর্শনের ভাবনা অনুযায়ী ত্যাগ ও সংযমই হলো এইসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এই পরিস্থিতিতে স্বস্তিকার প্রচার, প্রসার ও বিস্তার একান্তভাবেই জরুরী।'

স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যা-র আনুষ্ঠানিক উন্মোচনে সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য সংখ্যাটি তুলে দেন সুরেশ সোনীর হাতে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত অশোক দাশগুপ্ত ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহের লেখা ৩৫১ পাতার, ডিজিটাল পেপারে ছাপা বহু দুর্লভ ফটো সমেত '1946 : The Great Calcutta Killings And Noakhali Genocide---a historical study' গ্রন্থেরও আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হলো তরুণ বিজয়ের হাতে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকা'র সহ সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য ও শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর কসবা শাখার শিল্পীবৃন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ওপর পরিবেশিত রূপশ্রী দত্তের সঙ্গীত সভার মন কাড়ে।

বিদ্যার্থী পরিষদের ২৮তম রাজ্য সম্মেলন

নাগরিক সম্মেলনে পারুল মণ্ডল, সুনীল আম্বেকর, অমিতাভ ঘোষ, কেশবরাও দীক্ষিত, রবিরঞ্জন সেন ও গৌরচন্দ্র গড়াই।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ২৮তম রাজ্য সম্মেলন (প্রতিনিধি সভা) গত ৯-১০ এপ্রিল কলকাতা'র হরিয়ানা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ৩৫টি স্থান ও ১৫টি জেলা থেকে মোট ১২১ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন ও পারুল মণ্ডল যথাক্রমে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদিকা রূপে পুনর্নির্বাচিত হলেন। সম্মেলনে 'রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি' এবং 'রাজ্যের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি'র উপর দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৯ এপ্রিল বিকালে 'নাগরিক সম্মেলন'-এ উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সভাপতি অমিতাভ ঘোষ ও বর্তমান অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর। অনুষ্ঠানে অমিতাভ ঘোষকে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া সম্মেলনে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ভাষণ দেন।

শ্রীরাম সারাজীবন বনবাসীদের সহযোগিতা করেছেন : শ্রীকান্ত শর্মা

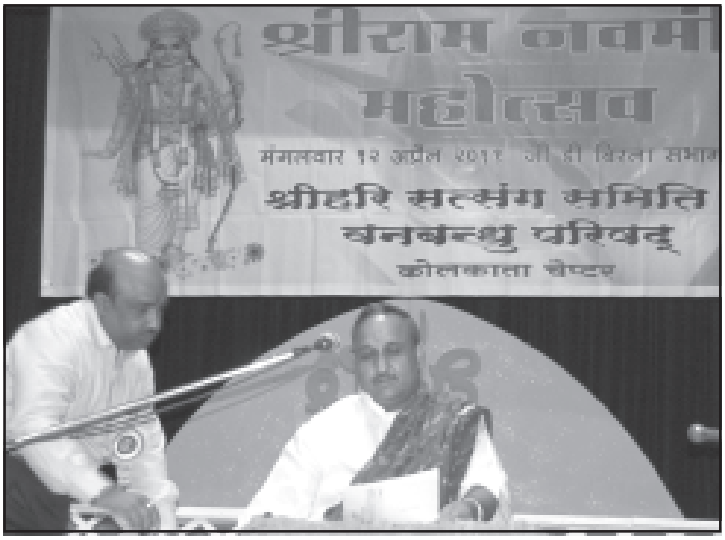

কথাকার শ্রীকৃষ্ণ শর্মাকে স্বাগত জানাচ্ছেন সজ্জন ভজনকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জীবনব্যাপী বনবাসীদের আপন করে নিয়েছেন, সর্বত্র সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজে কখনও সিংহাসনে বসার জন্য লালায়িত হননি। এখনকার ভারতে আমরা সবাই দেখছি গদী দখলের কী কদর্য লড়াই সর্বত্র চলছে। 'রামরাজ্য' অযোধ্যার ছবিটা ছিল—রাম, ভরত কেউই সিংহাসনে বসতে চান না। রামচন্দ্র তো রাজ-সিংহাসন অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে বনবাসে গিয়েছিলেন।''

গত ১২ এপ্রিল শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি এবং বনবন্ধু পরিষদের কলকাতা শাখা আয়োজিত শ্রীরামনবমী উৎসবে শ্রীরামকথা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন বিখ্যাত কথাকার শ্রীকান্ত শর্মা। ভজন গান এবং শ্রীরামকথার মাধ্যমে দু'ঘণ্টারও বেশি বিড়লা সভাগারের হলভর্তি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। 'বালব্যাস' শ্রীকান্তজী শর্মাকে মালা দিয়ে বরণ করে নেন সজ্জনজী ভজনকা। এদিন স্বাগত ভাষণ দেন সত্যনারায়ণজী দেওরালিয়া এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চন্দ্রমোহন আগরওয়াল।

মিথ্যাচারে ভরা ইস্তাহারই বলে দিচ্ছে এবার বামফ্রন্টের ফল কী হবে

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে এবারের বিধানসভার নির্বাচনের লড়াই বামপন্থী এবং বাম বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক মানুষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই বাঁচার লড়াই। রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। যুযুধান দুই পক্ষই জানে এই লড়াই জিততেই হবে। বদল হলে বদলাও হবে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মা মাটি মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, 'আর রক্ত নয়। সন্ত্রাস নয়। সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা গড়তে রাজনৈতিক পরিবর্তন করুন। মনে রাখবেন বদলা নয়, বদল চাই।' বলা যেতে পারে যে মমতা 'বদলা' না চাইলেও তাঁর দলের প্রধান প্রতিপক্ষ সি পি এম আশ্রিত হার্মাদরা 'বদলা' নিতে পারে। ইতিমধ্যেই জামুরিয়া, বারাকপুর, বসিরহাটে তৃণমূল কর্মী নেতারা আক্রান্ত হয়েছেন। রক্ত ঝরেছে। হয়তো আরও ঝরবে। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহারে সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা গড়ার কথা বলা হলেও বামফ্রন্টের ইস্তাহারে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল যাইহোক না কেন বদলার রাজনীতি অনুসরণ করা হবে না এমন কথাও বামফ্রন্টের ইস্তাহারে বলা হয়নি।

তবে কী বলা হয়েছে বামফ্রন্টের ইস্তাহারে সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে রাখা দরকার বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সিপিএম রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক বিমান বসু যে ইস্তাহারটি প্রকাশ করেছেন তার মলাটে লেখা হয়েছে 'ইশ্‌তেহার'। সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, সঠিক বাক্যটি হবে ইশতিহার অথবা ইস্তাহার। অর্থাৎ গোড়াতেই গলদ। লেখক সাংবাদিক অমিতাভ গুপ্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, ''বামফ্রন্ট সরকারের ভাগ্য ভাল, গত তিন দশকে এই রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গে) যাঁরা লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ বাংলা বাক্য পড়ে তার অর্থোদ্ধার করতে পারেন না'। বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার মনযোগ দিয়ে পড়ারও প্রয়োজন হয় না। কারণ, সেখানে থাকে সেই গতানুগতিক কথা। যেমন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বামপন্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারার অকৃত্রিম আনন্দ, বাবরি মসজিদ পরবর্তী দাঙ্গায় মুসলমান জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারার ঐতিহাসিক গর্ব এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামী অঙ্গীকার। সত্যিই কিছু কিছু জিনিস কখনও বদলায় না। ব্রিগেডে মহতী জনসভা ডেকে শহর অচল করে দেওয়ার শাশ্বত অভ্যাসটির মতোই।

কিন্তু এবার কিছু করার জন্য সরকার কীভাবে চেষ্টা করবে, সেই কথাটুকুতো বামফ্রন্টের ইস্তাহারে থাকতে পারত। ভেবেছিলাম, ৩৫ বছরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে যে অন্ধকারে পৌঁছে দিয়েছেন, সেখান

গূঢ়পুরুষের

কলম

থেকে ফেরার পথ খোঁজার কিছু ইঙ্গিত অন্তত ইস্তাহারে থাকবে। বলছে, ১৯৭৭ সালে রাজ্যে মোট ৭৪ লক্ষ টন শস্য উৎপন্ন হত, আর ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৭০ লক্ষ টনে। প্রায় আড়াই গুণ। সরকারের কৃতিত্ব? গড়ে বছরে কৃষি উৎপাদন ২.৪৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। আড়াই শতাংশেরও কম। সরকার যদি একে কৃতিত্ব বলে দাবি করে, তা হলে কৃতিত্ব অবশ্যই। ভুলে গেলে চলবে না, এই অঙ্কের একটা বড় অংশ এসেছে আশির দশকের 'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলে। বামফ্রন্টের নিজস্ব সবুজ বিপ্লব, যাতে যথেচ্ছ পাম্পসেট লাগিয়ে জল তুলে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করা হয়েছিল। সেই সবুজ বিপ্লবের ফলেই নব্বইয়ের দশক থেকে কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্রমে স্থবির হয়ে আসছে। সেই সবুজ বিপ্লবের ফলেই পশ্চিমবঙ্গ আর্সেনিক দূষণের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই, কৃষির কথা যত কম বলা যায়, বামফ্রন্টের ততই মঙ্গল।

ইস্তাহার বলছে, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ৩৭টি হিমঘর গড়ে তুলেছে। প্রশ্ন হল, সেই হিমঘর ক্ষুদ্র, দরিদ্র চাষীদের কতখানি উপকারে আসছে? ক্ষেত থেকে হিমঘরে ফসল পৌঁছনো এই রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে কতটা কঠিন? কত দফা মধ্যসত্ত্বভোগী পেরিয়ে তবে ফসল হিমঘর হয়ে বাজারে পৌঁছয়? বাজারে ফসল যে দামে বিক্রি হয়, তার কত শতাংশ কৃষকের হাতে পৌঁছয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কৃষিজীবী মানুষরা জানেন। অনুমান করা চলে, বামফ্রন্টের কর্তারাও জানেন। কিন্তু এই কথাগুলোতো আর নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখা যায় না। যেমন, এটাও লেখা যায় না যে গ্রামে পাকা রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একেবারে পিছনের সারিতে। ২০০৮ সালের হিসেব বলছে, রাজ্যের ৫৬.২ শতাংশ জনবসতি এলাকা সড়ক সংযোগহীন। সড়ক তৈরি করতে রাজ্য সরকারের টাকা খরচ হোত, তা-ও-নয়, ২০০১ সাল থেকে দেশে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ সড়ক যোজনা নামের এক প্রকল্প চালু আছে। গ্রামে রাস্তা তৈরি করার জন্য পুরো টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। তবু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রাস্তা তৈরি হয়নি, হয় না। কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর রাজ্যবাসী অভিজ্ঞতায় জানেন। আর এটাও জানেন, রাস্তা নেই বলে গাড়ি চলার সুযোগও নেই, আর তাই সাধারণ চাষির পক্ষে নিজের ফসল বাজারে পৌঁছে দেওয়া কার্যত অসম্ভব। ফলে, ফড়েরাই ভরসা। হিমঘরের হিসেব দিয়ে তাই কৃষকের উন্নয়নের গল্প বলা চলে না।

পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা এককথায় ভয়াবহ। রাজ্যের ৭৮ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার ও ৪৭ শতাংশ শিশু মাঝারি থেকে বেশি অপুষ্টির শিকার। ভারতবর্ষে এই গড় যথাক্রমে ৭২ শতাংশ ও ৪২ শতাংশ। মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতা ৬৩.২ শতাংশ (ভারতে ৫২ শতাংশ) ও অপুষ্টি ৬২ শতাংশ (ভারতে ৫০.৫০ শতাংশ)। নানা স্বাস্থ্য সূচকের ক্ষেত্রে আমাদের স্থান ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে ১৯ থেকে ২৪ নম্বরে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়মিত বাণী দেন যে এ রাজ্যে নাকি ৭০ শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পান। জেনেশুনে অসত্য ভাষণ? সরকারি পরিষেবা পান এমন পশ্চিমবঙ্গবাসীর সংখ্যা মাত্র ২৪ শতাংশ সেখানে ভারতের গড় ২৯ শতাংশ। চিকিৎসায় মোট খরচের মাত্র ৯ শতাংশ বহন করে সরকার, ৯১ শতাংশ-ই আসে রোগীর পকেট থেকে।

এ রাজ্যে চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দু'বেলা সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে 'আমার সরকার আমার পাশে'। মিথ্যাচার অপপ্রচারকে সিপিএম শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে। তাই বলছি নির্বাচনের ফল এবার কি হবে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে মিথ্যাচারে ভরা বামফ্রন্টের 'ইশ্‌তেহারে'। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই পরজীবী, হিংস্র, মিথ্যাবাদী সরকার ও তাদের পরিচালক নেতা-নেত্রীদের সমূলে উৎপাটন না করলে আর আমাদের পরিত্রাণের উপায় নেই।

রাজ্য রাজনীতি

নির্বাচনী অভিযানে খুন-খারাপি শুরু
কয়লা-মাফিয়াদের গাড়ী পিষে দিচ্ছে প্রার্থীকে

নিশাকর সোম

নির্বাচনী অভিযানে এক খুনখারাপি পর্ব শুরু হয়েছে। এবারও বিরোধীদলকে আক্রমণ করা, ইতঃস্তত গুলি করা, ছুরি মেরে হত্যা করা, গুম করা ইত্যাদির মাধ্যমে একটা আতঙ্ক এবং ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। এরই প্রকাশ দেখা গেল বর্ধমান জেলায়। সেখানে জামুরিয়াতে তৃণমূলের প্রার্থীর উপর আক্রমণ করা হয়, জামুরিয়াতে তৃণমূলপ্রার্থী প্রভাত চ্যাটার্জিকে পুলিশের সামনেই বেধড়ক মারা হলো। তাঁর সঙ্গী তৃণমূলের কর্মী রবীন কাজির দেহের উপর গাড়ি চালিয়ে পিষে মেরে ফেলা হয়। রবীন কাজি দলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা। রবীন কাজির মাথার ঘিলু বেরিয়ে যায়। তৃণমূলের দুটি প্রচার গাড়ী ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রভাতবাবুকে ২ এপ্রিল প্রচার করার সময়ে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং তিনি পুলিশকে এই আক্রমণের কথা জানানো সত্ত্বেও এ ঘটনা ঘটল। এ এক নৃশংস বর্বোরচিত ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড। এই হত্যালীলার নায়ক হলো—আসানসোল মহকুমার কয়লা-মাফিয়ারা। এই কয়লা-মাফিয়ারা সিপিএম-এর 'অ্যাকশন স্কোয়াড'-এর মূলশক্তি। ঠিক এই ঘটনার একদিন পরেই রায়নাতে তৃণমূলপ্রার্থীও আক্রান্ত হয়েছেন। এ দু'টি ঘটনাই বর্ধমান জেলাতে।

এই বর্ধমান জেলাতেই সাঁইবাড়ির ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা করে রক্ত মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মায়ের গায়ে। এই রক্তস্রোত—মায়ের ক্রন্দন অভিশাপ হয়ে ঝরে পড়ে। সিপিএম-এর নেতা বিনয় কোঙারকে দীর্ঘদিন কারাবাস করতে হয়। বস্তুত বর্ধমানে আসানসোল মহকুমাতে কয়লা-মাফিয়াদের পৃষ্ঠপোষক সিপিএম। বহু বছর পূর্বে আসানসোলের এক প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় পাল মাফিয়ারাজের মধ্যে সিপিএম-এর ঢুকে পড়াটাকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি পার্টি ত্যাগ করেন। যেমন বর্ধমানের আর এক নেতা পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন,—''গভর্নমেন্ট অফ দ্য প্রমোটার, বাই দ্য প্রমোটার, ফর দ্য প্রমোটার।'' বিনয়বাবুর এই উক্তির জবাবে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন— ''বিনয়বাবু মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাচ্ছেন না কেন?'' সিপিএম-এর মারকাটারি লাইনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বর্ধমানের নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। বর্ধমানের পার্টি চিরদিনই ধনী কৃষকদের এবং মাফিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। তাঁদের আর্থিক এবং শারীরিক মদতে এই জেলায় সিপিএম প্রধান শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে!

বিনয় কোঙার

বিনয় চৌধুরী

হরেকৃষ্ণবাবুর চ্যালারাই এখন বর্ধমান জেলায় নেতৃত্ব করছে। সিপিএম-এর মনে রাখা দরকার—প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এরপরই সিপিএম অভিযোগ করছে যে বেহালায় তাঁদের পার্টির লোকাল কমিটির এক সদস্যকে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে। আসলে সিপিএম সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কোণঠাসা অবস্থায় মরিয়া হয়ে হিংস্রতার পথ ধরেছে। ভয় দেখিয়ে অযথা ভোটের কাজে বিরত থাকার আবহাওয়া সৃষ্টি করছে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের সামনে সমস্ত সন্ত্রাস উড়ে যাবে। মানুষের জয়যাত্রা এগিয়ে যাবেই। এটাই ইতিহাস। স্তালিন-হিটলার-মুসোলিনি-র একনায়কতন্ত্রও ধ্বংস হয়ে গেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, জামুরিয়া ঘটনার নায়ক সিপিএম কর্মী দীনু ওরফে দীনবন্ধু বাউড়িকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শুধু জামুরিয়া নয়—ঘাটাল, কেশপুর, খেজুরি, আরামবাগেও সিপিএম-এর সন্ত্রাস চলছে। শিলিগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার পরই বেহালা পশ্চিম লোকাল কমিটির সদস্য সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় চপারের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সত্যব্রতবাবু বিরোধী নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রের ১২৯নং ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতা। শুধু বর্ধমান জেলায় নয়। কলকাতা বাদে সকল জেলাতেই সিপিএম বিরোধী শিবিরকে আক্রমণ করে ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের এই কৌশল ব্যর্থ হবে। কারণ সিপিএম-এর বিরুদ্ধে জনগণের রোষ এখনও ধূমায়িত। তারই প্রতিফলন পড়বে ভোটদানে। এমতাবস্থায় সিপিএম নেতারা বিশেষ করে বিমান বসু, মদন ঘোষ, বিনয় কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য এবং দীপক সরকার ছুটে ছুটে সামাল সামাল রব তুলেছে। এ যেন ঝড়ের মুখে বদর বদর (পীর) এবং মন্ত্রজপ।

যাদবপুরে বুদ্ধদেববাবুকে হারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সিপিএম-এর সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও রবীন দেব-কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিমান বসু যাদবপুরে 'চেক-আপ' সভা করছেন।

পার্টিকর্মীদের উৎসাহে উদ্দীপিত করার জন্য বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ করে সিপিএম-এর রাজ্যনেতৃত্ব বলছেন, 'ক্ষমতায় আমরা আসছিই।' জনগণ কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, এবার সিপিএমকে শিক্ষা দিতে হবে।

এই নির্বাচনে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ্য। মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার বিরুদ্ধে তৃণমূল-এর প্রার্থী নেই। এই কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সিটটি ছেড়ে দিয়েছেন নেত্রী। অন্যদিকে সবং-এ মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে সিপিএম বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস-কে ছেড়ে দিয়েছে। এই কেন্দ্রে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন— সিপিএম থেকে একদা বহিষ্কৃত ব্যক্তি। তবে তৃণমূলের জয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি ছবি এঁকে বিক্রি করে প্রায় চার কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

দিশাহারা হয়ে সিপিএম-নেতারা পুলিশ-প্রশাসন—নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের পক্ষে কাজ করছে বলে আর্তনাদ করছেন। তাঁরা যা করেছিলেন সেটাই বোধহয় এবার ব্যুমেরাং হচ্ছে।

এই সময়

মাতৃ-বন্দনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটিকে 'স্বদেশী আত্মা' বলে অভিহিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে এই গানটি একদিকে যেমন জাতীয় সঙ্গীতের অভিধা গ্রহণ করেছিল, তেমনি অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা মৌলবাদী তৎকালীন সদ্যজাত মুসলিম লিগের রোষে পড়ে গিয়েছিল। তাই আজ বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম সঙ্গীতের মর্যাদা পেলেও স্বাধীনতা উত্তর সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতির কারণে মূলত কংগ্রেসের জন্যই 'জাতীয় সঙ্গীতে'র স্বীকৃতি পায়নি গীতটি। সম্প্রতি আন্না হাজারে দেশব্যাপী আর্থিক দুর্নীতির প্রতিবাদে দিল্লীর যন্তরমন্তরে যে অনশন কর্মসূচী পালন করছিলেন সেই মঞ্চে সারাদিন বাজলো এই গানটি। আন্না হাজারের সমর্থকেরা বারেবারেই বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি রোধে আপাতত তাই মাতৃ-বন্দনাতেই ভরসা রাখছেন গান্ধীবাদীরা।

পদত্যাগে প্রস্তুত

পদত্যাগে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দিলেন পন্ডিচেরীর লেফট্যানেন্ট গভর্নর ইকবাল সিং। হাসান আলি খান আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নাম। তারপরেও কেন্দ্রীয় মদতে অনমনীয় ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মাত্রা বাড়ছে দেখে রীতিমতো বিপাকে পড়ে যান তিনি। জানিয়ে দেন যেকোনওরকম তদন্তে প্রস্তুত। তাতেও না কুলোলে মায় পদত্যাগেও আপত্তি নেই তাঁর। নিন্দুকেরা মুচকি হেসে বলছেন—আন্না হাজারের অনশনে কি বোধোদয় ফিরল তাঁদের, যাঁরা আর্থিক দুর্নীতির পাহাড়ে চড়েছেন? না কি আন্না হাজারে সমেত পুরোটাই কংগ্রেসী গেমপ্ল্যান? এই সংশয়ের মধ্যেই বিরোধীদের সংকল্প নতুন করে দানা বাঁধছে—যাই করো বাপু, দুর্নীতি'র পাপ কি আর কংগ্রেসী বাপকে ছাড়বে!

'প্রধানমন্ত্রী'ই বটে

বিদেশ সফররত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর বিশেষ বিমানে বসে জনৈক সাংবাদিককে বলে ফেলেছেন, তিনি যদি ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি করতে পারেন তবে তাঁর কাজ তিনি খুব ভালভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে মনে করবেন। ইদানীংকালে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মোহালিতে ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসা পাক-প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী-র সঙ্গে এনিয়ে একপ্রস্থ কথা হয় তাঁর। গোপন সূত্রের খবর, তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অথচ আশা ছাড়তে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী। কূটনীতিকরা মনে করছেন, একাধিক বৃহত্তর আর্থিক দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সমস্যায় (যার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ অন্যতম) জর্জরিত প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতেই আশার গল্প শোনাচ্ছেন। যা শুনে এক রসিকের মন্তব্য, 'মেরুদণ্ডহীন প্রধানমন্ত্রী'র অপবাদ ঘোচাতে দেশের মানুষের ওপর আর নয়, দেশের শত্রুদের ওপরই ভরসা করছেন মনমোহন সিং। 'প্রধানমন্ত্রী'ই বটে!

উৎসাহিত মাওবাদ

ঝালানাথ খানাল-কে ভারতে আসার আমন্ত্রণ করতে ছুটছেন বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা স্বয়ং। ঝালানাথ খানাল-কে জানেন তো? নেপালের সদ্য- নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। নাক সিঁটকোচ্ছেন না কি? আরে মশাই, ইউ পি এ জমানা এখন, এন ডি এ-তো নয়, যুগ পাল্টে গেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য কর্তব্যবোধে এখন আর ভারতে নির্বাচিত হওয়া মাত্রই আসেন না। এদেশের বিদেশমন্ত্রীকে সেখানে ছুটে গিয়ে হাতে পায়ে ধরতে হয়! এদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখে যতই মাওবাদের বিরুদ্ধে বুলি কপচান, তাঁর সরকারেরই বিদেশমন্ত্রী একদা, নিদেনপক্ষে এই সেদিন এন ডি এ আমলেও যে দেশ ভারতবর্ষেরই ছত্র-ছায়ায় ছিল, আজ ইউ পি এ আমলে সেখানকার মাওবাদীদের তোয়াজ করতে ছোটেন। কারণ মাওবাদীরা নেপালে চলা একাধিক ভারতীয় প্রকল্প রূপায়ণে রীতিমতো বাগড়া দিচ্ছে। তার ওপর মাওনেতা পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সদ্য-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানাল তাঁর পূর্বসূরীদের ব্রাত্য রেখে ভারতে না এসে, প্রথমে চীন ভ্রমণে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সবই দেখছেন, বুঝছেন কিন্তু অনুনয়-বিনয়টা আর ছাড়তে পারছেন না। সেই সুহৃদের কথা মনে পড়ছে যিনি বলেছিলেন এদের মেরুদণ্ডহীন বললে, সত্যিকারের মেরুদণ্ডহীনেরা 'মানহানি'র মামলা করবেন।

চীনা জাল বিস্তার

৬৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে মধ্য এশিয়া ঘুরে ইউরোপ পর্যন্ত জাল বিস্তার করার লক্ষ্যে 'নতুন সিল্ক রোড' তৈরির পরিকল্পনা নিল চীন। চীনা-ডেইলি-তে প্রকাশিত তথ্য বলছে—''খাসগড় এবং এরকেশঅমের মধ্যে ২১৩ কিমি দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে আগামী ২০১৩-র মধ্যে এটি ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে''। সরকারি আমলা এবং বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে ওই চীনা দৈনিকটি জানিয়েছে, আগামীদিনে ওইপথ জুড়ে ইউরোপ পর্যন্ত 'সিল্ক ট্র্যাক' রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। অন্তত, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য এশিয়ায় এধরনের জাল বিস্তারের কাজ চীন বহুদিন আগেই শুরু করে দিয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চীনের বর্তমান মূল শত্রু এখন আমেরিকা নয়, ভারত। সুতরাং ভারতকে বিপাকে ফেলাই যে এই ধরনের জাল বিস্তারের প্রাথমিক লক্ষ্য, তা অনুমান করে বেশ আশঙ্কিত দেশের কূটনীতিকরা।

তৃণমূলের ইস্তাহার একটি পুস্তকমাত্র

কালো টাকা, মূল্য বৃদ্ধি, কমনওয়েলথ গেম্‌স কেলেঙ্কারী, ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী, আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারী— তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে। এ সব বিষয়ে মমতা দেবীর মুখে 'রা' নাই। তিনি শুধু জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী আর বাকী জেলাগুলি থেকে হার্মাদ বাহিনী খেদানোতে ব্যস্ত।

অমলেশ মিশ্র

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আর একটি 'অশুভ সঙ্কেত' অর্থাৎ একটি পুস্তক মাত্র।

এটা পড়া যায়, চমৎকৃত হওয়া যায় কিন্তু পরে বোঝা যায় শূন্যের মাঝারে ঘর। ইস্তাহার ৬৪ পৃষ্ঠার।

এই ইস্তাহার তিনি তৈরি করেছেন তার যাবতীয় রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার ছবি নিয়ে। বলা যায় 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' করেছেন এই রচনা। দু'ভাগে বিভক্ত এই ইস্তাহার ৪২ পৃষ্ঠা একটি ভাগ, ২২ পৃষ্ঠা অপর ভাগ। প্রথম ৪২ পৃষ্ঠায় যা যা বলা হয়েছে তা তার দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরার বহিরঙ্গের মতো। আর ২২ পৃষ্ঠার অংশে আছে রেল প্রতিভা— রেল স্টেশন গুলির রং বদল করার মতো। রং উৎপাদক কোম্পানীগুলির কাছে লক্ষ লক্ষ কেজি রঙ এর অর্ডার দেওয়া। চাইলে যে কেউ ওই অর্ডার দিয়েই কয়েকশ কোটি টাকার কাট মানি পেতে পারে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের খবর কাগজগুলি ভাবতেই পারেনি আচমকা এত কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পাবে। কোন রঙ উৎপাদক কারখানাও ভাবতে পারবে না আচমকা এত রঙের অর্ডার। এমনই অর্ডারের বাহার এই ইস্তাহারে।

ইস্তাহারে সব কিছুই আছে। নেই শুধু জ্বলন্ত সমস্যা দুটির কথা— মাওবাদী সমস্যা কী ভাবে সামলাবে তার সরকার। নাই শুধু দার্জিলিং সমস্যার কথা। কী ভাবে সামলাবে তার সরকার।

তবে তার যে খুব প্রয়োজন আছে তাও নয়। আবেগ বাস্তবকে মানে না। তিনি দলতন্ত্র তুলে গণতন্ত্র আনবেন। যে সব এলাকা এখন তৃণমূলীদের দখলে সেই সব এলাকায় বোঝাই যায় কী ভয়ংকর গণতন্ত্র তৃণমূল প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্বাচনের প্রার্থী যদি অ-তৃণমূল হয় সে প্রচারেই যেতে পারবে না। যেমন ঘটছে নন্দীগ্রামে। কংগ্রেসের এক কেন্দ্রীয় যুব নেত্রী খেজুরীতে সভা করতে এসেছিলেন। বলা হয়েছিল অমুক বাবুদের অনুমতি ছাড়া সভা করা যাবে না। তৃণমূলের গণতন্ত্র এই রকমই হবে।

ইস্তাহারে প্রথম ৪২ পাতায় আছে তার সরকার কি কি করবে। ফিরিস্তি এতই লম্বা (৪২ পাতা), সহজ হোত যদি তিনি তার এই পুস্তকে লিখতেন তিনি কী কী করবেন না। কৃষি, শিল্প, রাস্তা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এক কথায় মাওবাদ আর দার্জিলিং সমস্যা বাদ দিয়ে সব কিছুই।

এই পুস্তক ইস্তাহার নাম দিয়ে প্রকাশিত হলো ২১ মার্চ ২০১১ সোমবার। তিনি বলেছেন যে তার সরকার ২০০ দিন অন্তর (অর্থাৎ ৬-৭ মাস) কাজের কৈফিয়ৎ দেবে। এ এক নজিরবিহীন বিষয় যা এই ইস্তাহার পুস্তকে উল্লিখিত। আমি এই প্রসঙ্গে জানতে চাইব তিনি ইতিপূর্বে তার লিখিত পুস্তকে যা যা বলেছেন বা লিখেছেন সেগুলি পালন করছেন কি? বা সেই মনোভাব এখনও বজায় রেখেছেন কি?

তার ইস্তাহার পুস্তকে লেখা হয়েছে নতুন বাংলা গড়া হবে, নলেজ মিশন হবে। ওয়ার্ক কালচার কমিশন, কর্মসংস্থান ব্যাংক, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, নিরপেক্ষ পুলিশ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র সুরক্ষা, সব ধর্ম, জাতি, বর্ণ, সংখ্যালঘু, তপশীলি, ও বি সি, উদ্বাস্তুদের সমান অধিকার বন্দীমুক্তি কমিটি গঠন, একশো দিনের মধ্যে পাহাড় সমস্যা সমাধান। বাংলাকে ভাগ না করে, জঙ্গলমহলে যৌথ অভিযান নয়, গণতান্ত্রিক সরকার, কৃষি বৈচিত্র্য, কৃষক সুরক্ষা, শিল্পে সবুজ বিপ্লব, ল্যাণ্ড ব্যাংক, কোলকাতাকে আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র করা, ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন, চা থেকে পাট— ট্রাডিশন্যাল শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন লগ্নি, তৃণমূল স্বাস্থ্য-পরিষেবা যোজনা, চলচ্চিত্র জগতের আধুনিক পরিকাঠামো তৈরী, নিখুঁত বিপিএল তালিকা তৈরি, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন যোজনা, শ্রমিক স্বার্থ অটুট রেখে শিল্পে উৎপাদন বাড়ানো, সব গ্রামে বিদ্যুৎ, সব পঞ্চায়েতে পানীয় জল, সেচখাল সংস্কার, নদী-খাল-বিল

সংযোগ, গরীবদের জন্য হাউস ফর অল, একলানির সবুজ প্রকল্প, ১৭টি মেডিক্যাল কলেজ, আই. টি. সেক্টর? উন্নয়ন, রবীন্দ্রনাথের নামে আন্তর্জাতিক মানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, নজরুলের নামে গবেষণা কেন্দ্র, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংস্কার, সড়ক ও সেচে পিপিপি মডেল অনুসরণ, হিমঘরের অভাব দূর করা, গ্রামীণ কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, বাংলার সমস্ত গণহত্যার বিচার, ছ'মাসের মধ্যে তদন্তের ব্যবস্থা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। পরবর্তী ২২ পৃষ্ঠায় আছে রেলের কৃতিত্ব, যে মন্ত্রকের তিনি মন্ত্রী। কিন্তু তার দলের আরও ছয়জন মন্ত্রী আছেন। তারা কে কী করেছেন গত ২ বছরে তার একটা ফিরিস্তি থাকল না কেন? ছয় মন্ত্রীর জন্য ছয় পৃষ্ঠা না হয় খরচ হোত। গ্রামোন্নয়নে শিশির অধিকারী কী করেছেন, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী জাটুয়া কী করেছেন, জাহাজ দপ্তরে মুকুল রায়-এর কী কৃতিত্ব—এগুলি মানুষের জানার আগ্রহ আছে। রেলের ব্যাপার মানুষ বরং কিছু কিছু জানে, কিন্তু তৃণমূলের বাকী ছয় মন্ত্রীর ক্যারিশ্‌মা রাজ্যবাসী জানেনই না।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে সেটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে মমতা দেবী তখন প্রতিষ্ঠিত রেলমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, জোট সরকারের প্রধানতম শরিক। কালো টাকা, মূল্য বৃদ্ধি, কমনওয়েলথ গেম্‌স কেলেঙ্কারী, ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী, আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারী— তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে। এ সব বিষয়ে মমতা দেবীর মুখে 'রা' নাই। তিনি শুধু জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী আর বাকী জেলাগুলি থেকে হার্মাদ বাহিনী খেদানোতে ব্যস্ত। প্রতিদিন একটি করে প্রকল্পের উদ্বোধন— কাগজে কাগজে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন— সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেউলিয়া রেল দপ্তর।

এই সময়েই অশুভ সংকেতের তৃতীয় সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ২০১০। কী আছে এই 'অশুভ সংকেত'-এ?

পৃষ্ঠা—৩৯—আগে রাজনীতির মধ্যে একটা Transparency ছিল। এখন Transparency-র পরিবর্তে এসেছে hypocracy। এখন ভারতবর্ষে বহু সৎ ও আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ আছেন। কিন্তু অবক্ষয়ের ধূমকেতুর ধূমপানে তারা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছেন...এখনকার রাজনীতির বেশীর ভাগটাই হয়ে গেছে নীতি বহির্ভূত রীতি।

(এই যার উপলব্ধি তিনি দেশ জুড়ে যারা চরম দুর্নীতি করছেন তাদের শরিক হয়ে থাকেন কী করে? কাজে আর কথায় মিল না থাকাকে বলা হয় দ্বিচারিতা— লেখক) ইস্তাহারের ৮৯ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে—দেশের অশুভ সঙ্কেত। অপ্রিয় হলেও একথা সত্যি যে ভারত সরকারের কোষাগারে যা অর্থ আছে তার থেকে অনেক বেশী অর্থ আছে কয়েকজন শিল্পপতির কাছে।...তবে একথা ঠিক যে তাদের অঙ্গুলি হেলনেই বেশী সরকারী সিদ্ধান্ত হয়। কার ক্ষমতা আছে তাদের কথা না শোনার। তারা ইচ্ছা করলে একটা সরকার কিনে নিতে পারে, তৈরী করতে পারে, আবার বদলে দিতে পারে। এরাই আবার বেশীর ভাগ mediaও control করে। ...আর এখন নির্বাচনে কোনও দলকে ক্ষমতায় আনলে সাধারণ মানুষের নয়, নিজেদের কতটা লাভ হবে তাই ভেবে এখন কি গোপনে লবি করেন? (২২.০৭.০৮-সংসদে ঘুষ দিয়ে সাংসদ কেনার ঘটনা নিয়ে তখন হয়েছে এখনও তোলপাড় হচ্ছে। মমতা তখনও চুপ ছিলেন এখনও আছেন। উপলব্ধি ও কাজের মধ্যে বিরাট ফাঁকটা আড়াল করা যাবে না। এখনও কোনও লবি মমতাকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চাইবেন?—লেখক)।

পৃ. ৯৪ ঃ এবার আমি একটা Sensitive Subject এ যাকে আমরা বলি কখনও ভ্রষ্টাচার, কখনও বলি দুর্নীতি আবার কখনও বলি Corruption যা সবার আড়ালে গোপনীয় জায়গায় হয়ে থাকে। সরকারের কোটি কোটি টাকা দিয়ে দুর্নীতির ভাণ্ডারের পরিবর্তে কারও কারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হয় (ভাষা প্রয়োগে দোষ আছে— লেখক) তখন ভাগাভাগিটা এমন ভাবেই হয় যে তা ধরাই মুস্কিল। Corruption এর যখন কোনও deal হয়— ধাপে ধাপে হয়—ত্রিধারা।

ধরুন ধারায় ধারায় Title clear করবে তার জন্য প্রথম ভাগের কমিশন তাদের হাতে। এবার প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপকে বলবে তোমরা এবার Clear কর— এটা দ্বিতীয় ধাপ, আর final বড় কর্তারা তাদের তো মুখে বলার কিছু নাই। ...এই title clear করতে যদি মোটা টাকা খরচ হয় তবে তাড়াতাড়ি Red-Aleart এর মতো file clear হয়ে যায়। (মমতা দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী আছেন পদ্ধতিটি জানেন। আর final clear তা ওই মন্ত্রকে ওরই হাতে ঃ লেখক)।

এতো গেল ২০০২ এবং ২০১০-এর সেপ্টেম্বর। এর মাঝে আরও কয়েকটা বছর আছে। সেই বছরগুলিতে দলীয় পত্রিকায় তিনি কিছু কিছু লিখেছেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ ঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দিল্লী কী ভাবছে তা দেখার জন্য পাড়ি দিয়েছিলাম দিল্লীতে। দেখলাম, অনুভব করলাম সাধারণ মানুষের ব্যাপারে একটুও কিছু ভাববার বা চিন্তা করবার কোনও তাপ বা উত্তাপ সরকারের নাই। সরকারের গায়ে বা মনে সাধারণ মানুষের জন্য ভাববার কোনও মাথা ব্যথা নাই। কারণ ক্ষমতার মাথা ব্যথাটাই তাদের কাছে বেশী প্রণিধানযোগ্য।

(২০০৪ সালের থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য আরও অনেক বেড়েছে। মমতা দেবীরও কোন মাথা ব্যথা আমরা লক্ষ্য করিনি। এখানেও মনের এবং মুখের গভীর গরমিল—লেখক)

ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঃ তিন তিন বার গত ছয় মাসের পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে নাগরিক জীবনের সব কিছুর দাম বেড়েছে। কোথায় যাবেন সাধারণ মানুষ? কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস, বিদ্যুৎ পেট্রোল, ডিজেল, সিমেন্ট সব কিছুর কখনও বা একলাফে কখনও বা লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়ছে। সরকার কী ভাবে চলছে?

একবারও তাদের ভাবতে সময় নাই যে সাধারণ মানুষ আর কত বোঝা সহ্য করতে পারবেন? বোঝা বইবার তো একটা ক্ষমতা থাকা দরকার।

(২০০৫-এ মমতা মন্ত্রী ছিলেন না। ২০০৯-এ মন্ত্রী হলেন—মূল্যবৃদ্ধি তারও অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে ২০১০-এ প্রায় লাগাম ছাড়া। ছয়মাসে ছয়বার পেট্রোপণ্যের দাম বেড়েছে। তার রেলে, চিনি, কয়লা, ইস্পাত, লোহা, সিমেন্ট সব কিছুর উপরই মাশুল বেড়েছে ২৭.১২.১০ তারিখ থেকে— লেখক)

এই পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিন ২০০৪ সালে 'ডিসেম্বরে কী বলেছিলেন। তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। এন ডি এ-তে ছিলেন। দলের একমাত্র সাংসদ।

শাসনের শাসানি একনায়কতন্ত্রের চেহারাকে আরও কলুষিত করল। যখন দেখা গেল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষ সরব, তখন রেলও বাড়িয়ে দিল ৪০০ কোটি টাকার বোঝা মানুষের উপর। এরই মধ্যে সাধারণ মানুষ যে কয়লা ব্যবহার করেন, সেই কয়লা লোহার উপর ফ্রেট চার্জ বাড়িয়ে দেওয়া মানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আরও একধাপে বেড়ে যাওয়া। অর্থাৎ কাঁধের উপর আরও চাপ। অর্থাৎ এতদিন কয়লাকে সরকার এসেন্সিয়াল কমোডিটি অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করত। এখন সেখান থেকে বের করে আনা হয়েছে। সুতরাং বোঝা কমানোর পরিবর্তে সরকার আবার নতুন করে কয়লার উপর সেস বাড়িয়ে ছিলেন (সূত্র ঃ গণশক্তি ১০.০১.১১)।

২০০৪ সালের রেল মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছেন ২০০৯ এর রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার তার থেকে কয়েকগুণ বেশী মূল্য বাড়িয়েছেন। তফাৎ হলো ২০০৯-এ রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৪ পৃষ্ঠার ইস্তাহারে যেমন ৪০০ একর জমির (অনিচ্ছুক চাষীদের) উল্লেখ নাই তেমনি জমি দিলে রেলে চাকুরী পাবে প্রসঙ্গটিও অনুল্লেখিত। এক কথায় এই ইস্তাহারটিকে অশুভ সংকেত (২) বলা যায়।

মোদী : এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

অতিথি কলম

তভলীন সিং

সম্প্রতি ''ইন্ডিয়া-টু-ডে'' আয়োজিত এক সম্মেলনে মোদী আসার আগে থেকেই তাঁর উপস্থিতি নিয়ে নানারকম জল্পনা চলছিল। এর মধ্যে যারা আবার তথাকথিত উদারপন্থী তারা তখন মোদীর বিরুদ্ধে সমালোচনায় বিভোর। সাংবাদিকরা যারা দৃশ্যত বিরুদ্ধপন্থী তারা ২০০২-র দাঙ্গা সম্পর্কে নানান প্রশ্ন রচনায় ব্যস্ত, কীভাবে মোদিকে বিব্রত করা যায় সেই লক্ষ্যে। শ্রোতাদের মধ্যে আবার যারা 'ড্রইংরুম' বুদ্ধিজীবী তারা দেশের সবচেয়ে দ্রুততম উন্নত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে তাদের খোলাখুলি মনোভাব থাকলেও মোদী সম্পর্কে তারা বিরক্ত এমন মনোভাব গোপনও করেনি।

সার্বিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রুপ, খোঁচা থাকলেও তিনি তা সিদ্ধহস্তে সামলেছেন। 'আজতক' চ্যানেলের সভা পরিচালক অজয় কুমার একদিকে যেমন এই মনোভাব গোপন করেননি, অন্যত্র তিনি স্বীকারও করেছেন যে, মোদী নেতৃত্বাধীন গুজরাট উল্লেখযোগ্য আর্থিক উন্নয়ন করেছে। সেইসঙ্গে এটাও বলতে ভোলেননি যে, মোদী এক সুচতুর রাজনীতিক। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট— মোদী যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, ইনিই গুজরাট দাঙ্গায় পরোক্ষ মদতদাতা।

মোদী এই গালমন্দকে আমল না দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের দেশ কি বিশ্বে সর্বশক্তিমান হিসেবে গণ্য হবে'? প্রশ্নকর্তা নিজেই তাঁর জবাবে বলেছেন, অবশ্যই। গুজরাটের নেতৃত্বে থেকে তাঁর মনে হয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দেশ যদি এগোয় তবে বিশ্বে অন্যতম শক্তিধর দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, ''গুজরাট মডেলই প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা আর প্রশাসনের বিষয়ে নিন্দুকদের পরাজিত মানসিকতার মানুষদের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। গুজরাটে আমরা প্রমাণ করেছি যে, সেই সরকারী দপ্তর, অফিসার, সেই পুরাতন আইন-কানুন কেমনভাবে উন্নয়ন ঘটিয়েছে, পরিবর্তন এনেছে গুজরাটে।''

তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, একবিংশ শতক দুনিয়ায় 'এশিয়ার শতক' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং দুই জাতি চীন আর ভারত —এই দুই দেশ এখন সকলের লক্ষ্য। তিনি তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করলেন। এই তিনটি বিষয়ে ভারত চীনের থেকে এগিয়ে। এখানে গণতন্ত্র রয়েছে, রয়েছে যুবশক্তি আর বিচারব্যবস্থা। জাতিগঠনে এই তিন মৌলিক উপাদানই জরুরী। তাঁর ভাষণের বাকি অংশে তিনি বর্ণনা করলেন কীভাবে তিনি তাঁর নিন্দুকদের সমালোচনা সত্ত্বে গুজরাটকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন যা ওই নিন্দুকরাও স্বীকার করছেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, তাঁর এই সফলতার গূঢ় তত্ত্ব হলো মহাত্মা গান্ধীর নীতির মূল্যায়ন করা আর তাঁরই নির্দেশিত পন্থাকে কপিবুক স্টাইলে তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন যেমনটা গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনে করেছিলেন। তাঁর আগেও বহু নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে নিজেদের স্ব স্ব অস্তিত্বের ছাপ রেখেছেন, কিন্তু জনজাগরণে তাঁরা ব্যর্থ। আমজনতাকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেননি। দশবছর আগে মোদী মুখ্যমন্ত্রী হবার পর গুজরাটে যে সাফল্য এসেছে তার পিছনে রয়েছে জনতার যোগদান। এসেই তিনি জনতার এই অংশগ্রহণকে 'গণআন্দোলন' বলে আখ্যা দিলেন এবং এর মাধ্যমে

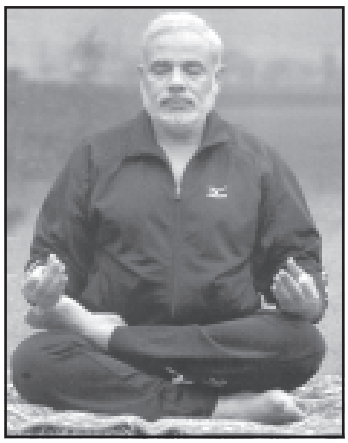

...যদি মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন তবে তা দেশের পক্ষে কত মঙ্গলকর হবে। সাধারণভাবে প্রশ্ন উঠল মোদী পরিচালিত হিংসার, কিন্তু তা নিমেষে উধাও হয়ে গেল আশা আর উৎসাহের আবর্তে যা মোদী তৈরি করেছেন। উপস্থিত প্রত্যেকে মানলেন যে, ভারতে মোদীর মতো দক্ষ নেতার প্রয়োজন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা প্রতিটি বিষয়কে তিনি জনমানসে পৌঁছে দিয়েছেন।

যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন তখন 'ড্রইংরুম' নিরপেক্ষরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন যে, যদি মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন তবে তা দেশের পক্ষে কত মঙ্গলকর হবে। সাধারণভাবে প্রশ্ন উঠল মোদী পরিচালিত হিংসার, কিন্তু তা নিমেষে উধাও হয়ে গেল আশা আর উৎসাহের আবর্তে যা মোদী তৈরি করেছেন। উপস্থিত প্রত্যেকে মানলেন যে, ভারতে মোদীর মতো দক্ষ নেতার প্রয়োজন।

আমরা গত কয়েকবছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর যে হতাশজনক কর্মপন্থা দেখছি, প্রধানমন্ত্রীর নিরুৎসাহ কর্মসূচীর তুলনায় মোদীর কর্মপন্থা, কর্মসূচী অনেকবেশী উৎসাহজনক। তিনি সভায় যে বক্তব্য রাখলেন তা আদৌ নতুন কিছুই নয়। নিরাশার আবহে আমরা অভ্যস্ত, এমন পরিস্থিতিতে মোদী তাঁর সরকারের সাফল্যের তালিকা পেশ করলেন। তাঁর তালিকায় ছিল তথ্য জানার অধিকারের আইন, শিক্ষার অধিকারের আইন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি অনেক কিছু। যখন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো দুর্নীতি, শিশু অপুষ্টি এবং কালো টাকার মতো দুর্নিবার ব্যর্থতার কথা, তখন তিনি মিষ্টভাষণে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন।

সেই সভা ছিল দুই তারকার উপস্থিতিতে উজ্জ্বল। তাঁদের মধ্যে একজন শাহরুখ খান এবং তারও এক বিশেষ কারণ ছিল। মোদী সেই সভায় বললেন, রাজনীতিতে, ভারত সরকারে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে। আমার বিশ্বাস যে, ওই দিন যদি শ্রোতাদের কাছ থেকে গণভোট নেওয়া হোত তবে আশি শতাংশ-এর অধিক শ্রোতা তাঁকেই ভোট দিত।

কিন্তু বহু তারকাখচিত ওই অধিবেশনে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে, নরেন্দ্র মোদী ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল। এমনকী সেখানে যাঁরা মোদী-ধোলাই মানসিকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরাও অন্য মনোভাব নিয়ে ফিরলেন। এটা সম্ভব হলো এইজন্য— তিনি সেখানে নিজের সাফল্যের জয়গান করেননি, বরং বললেন, উন্নত নিশানার লক্ষ্যে দেশকে পৌঁছে দিতে, সকলকে একযোগে কাজ করার পরামর্শও দিলেন।

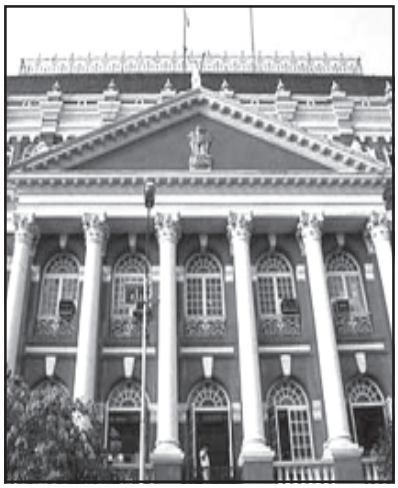

রাইটার্স দখলের যুদ্ধ

রাজ্যের মানুষ কেন পরিবর্তন চাইছেন?

নবকুমার ভট্টাচার্য

৩৪ বছরে বাম সরকার সাধারণ মানুষের জন্য প্রায় কিছুই করেনি। সাফল্য হিসেবে যা প্রচার করা হয় তা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। বছর বছর ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ করা হলেও যাওয়ার সময় রাজ্যবাসীর মাথায় অসীম দেনার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন এই সরকার। ... ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকার ছিল ১৭ লক্ষ। ২০০৮ সালে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ৭৭ লক্ষ।

এরাজ্যে বিধানসভার ভোটে কোনও পরিবর্তন আসছে কি না জানা যাবে ১৩ মে ভোট গণনার পর। কিন্তু রাজ্যের মানুষ আজ সত্যিই পরিবর্তন চাইছেন। কারণ ৩৪ বছরে এই সরকার সাধারণ মানুষের জন্য প্রায় কিছুই করেনি। সাফল্য হিসেবে যা প্রচার করা হয় তা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। বছর বছর ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ করা হলেও যাওয়ার সময় রাজ্যবাসীর মাথায় অসীম দেনার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন বাম সরকার। নয়া সরকার যখন শপথ নেবে তখন রাজ্যের প্রত্যেক লোকের মাথাপিছু ঋণের বোঝা দাঁড়াবে ২২,৯৭৮ টাকা। ১৬ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা যাবে শুধু সরকারি ধারের সুদ মেটাতে। তথ্য বলছে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ঋণে তৃতীয়, মাথাপিছু আয়ে অষ্টম এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যায় সপ্তম। বিগত বছরগুলির মতো এবছরও একই ভাষায় রাজ্য বিধানসভায় বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছেন— ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সমস্ত দেশে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ধারাবাহিক ভাবেই থেকেছে প্রথম স্থানে (বাজেট বিবৃতি পুস্তিকা, ২০০৯-১০, পৃ. ৭, অনু., ২.৫)। অথচ রাজ্য সরকারেরই তথ্য বলছে, 'ভূমি সংস্কারে বামফ্রন্ট সরকার শুধু ব্যর্থই নয়, পুর্বতন সরকারের আমলে অর্জিত সাফল্যটুকু ধরে রাখতেও অক্ষম। এই সরকার ১৯৭৭-এর আগের সরকারের ন্যস্ত ও খাসঘোষিত ১১.১২ লক্ষ একর জমির অবন্টিত অংশটুকু গত ২০০৭ পর্যন্ত বন্টন করে উঠতে পারেনি। ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই সরকার গড়ে বছরে ৬০০০ একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেছে (সূত্র-রাজ্য বাজেট বিবৃতি ২০০৫-০৬, পাতা ১০, অনু. ২.৪)। পরবর্তী বছরগুলিতে ৭০০০ বা ৮০০০ একর জমি বন্টিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে কৃষিজমির পারিবারিক উর্দ্ধসীমা আইন চালু হয়। বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াত ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী রাজ্য বিধানসভায় সরকারি বিবৃতিতে বলেছিলেন, এখন জমির সিলিং পরিবার ভিত্তিক। উর্দ্ধসীমা সেচ এলাকায় ১২ একর, অ-সেচ এলাকায় ১৭.৫ একর। সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কৃষিজমি অন্তত ৩৫ লক্ষ একর। প্রয়াত বিনয় চৌধুরী এই ৩৫ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত সিলিং বহির্ভূত জমির হিসাব দিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে ৩২ শতাংশ সেচমুক্ত কৃষিজমির উপর ভিত্তি করে। বর্তমানে সেচযুক্ত জমি ৭২ শতাংশ (বাজেট বিবৃতি, ২০০৯- ১০, পাতা-৮, অনু. ২.৬)। সরকারি হিসেবে রাজ্যে কৃষিজমির পরিমাণ ১,৪৩,৬৩, ৭২৬ একর। সেচযুক্ত জমি ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ নতুন করে ৫৭,৪৫,৪৯১ একর কৃষিজমি সেচযুক্ত হয়েছে। এই ৫৭,৪৫,৪৯১ একর কৃষিজমির ক্ষেত্রে পারিবারিক উর্দ্ধসীমা ১৭.৫ একর থেকে ১২ একর হয়েছে। স্বভাবতই সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কৃষিজমির পরিমাণ ৩৫ লক্ষ একর থেকে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে তা অন্তত ৫০ লক্ষ একর। এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ একর সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কৃষিজমির মধ্যে রয়েছে মাত্র ১৩ লক্ষ একর (যার মধ্যে ১১.১২ লক্ষ একরই সরকারে ন্যস্ত হয়েছে ১৯৭৭ সালের আগে)। অতিক্রান্ত তিন দশকে বাম সরকার ১.৮৮ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধারে সফল হয়েছেন। আর ৩৭ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত সিলিং বহির্ভূত কৃষিজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধার করে সরকারে ন্যস্ত ও খাস ঘোষণা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টনের সুযোগ ছিল। অথচ বাম সরকার তা করেনি। একে কি আদৌ সাফল্য বলা চলে? রাজ্য সরকার দাবি করে থাকেন ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। অথচ অমর্ত্য সেন সম্পাদিত প্রতীচী স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পান এমন মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে ২৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা ২৪ শতাংশ। প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্ট বলছে যে রাজ্যে প্রতি ৪২,২০৪ জন মানুষ প্রতি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে—যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি জেলায় (মালদহ, বাঁকুড়া ও উত্তর ২৪ পরগণা) তিন হাজারেরও বেশি পরিবার নিয়ে করা এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবার। গত সাড়ে তিন দশকের বাম আমলে রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। মুদালিয়ার কমিটির রিপোর্টও বলছে সাধারণ এলাকায় প্রতি ৪২ হাজার মানুষ পিছু একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যে ১৭৪৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০৬৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৪৯টি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কম রয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীন গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমীক্ষা—২০০৯ রিপোর্টে। গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে একজন মানুষকে গড়ে ৩.২ কিলোমিটার পথ পেরোতে হয়। আর খাতায় কলমে মোট ১২,১০১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৯৯৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কতগুলি চালু রয়েছে তা তদন্ত সাপেক্ষ! বহু জায়গাতেই চিকিৎসক

সপ্তাহে দু'দিন বা তিন দিন আসেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে জীবনদায়ী ওষুধ নেই, ব্যাণ্ডেজ-গজ-তুলো সেলাইয়ের সুতো কিছুই নেই। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমীক্ষার এই রিপোর্টেই জানা যাচ্ছে রাজ্যে পাঁচ হাজার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও ছ' হাজারের বেশি পুরুষকর্মী প্রয়োজন। গ্রামীণ স্বাস্থ্যমিশন খাতে গত পাঁচ বছরে রাজ্যে আসা ২১২৮ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৬৬২ কোটি টাকা খরচ করা যায়নি। পুষ্টির একটি প্রধান সূচক Body Mass Index (BMI)-এর হিসেবে এই রাজ্য ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে ১৯তম স্থানে। তিন বছরের নীচে গ্রামে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন শিশুর সংখ্যা রাজ্যে ৮২ শতাংশ, জাতীয় গড় ৭৪ শতাংশ। দেশের মধ্যে এই রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃতের হার দ্বিতীয় সর্বাধিক। সবচেয়ে দুঃখের কথা স্বাস্থ্য বিষয়ে এই রাজ্যে আছেন একজন পার্টটাইম মন্ত্রী।

● প্রায় ৫৬ শতাংশ রোগীকে এস এস কে এম হাসপাতালের বহির্বিভাগে ২ থেকে ৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় ডাক্তার দেখাতে।

● কোনও সরকারী হাসপাতালের সব রোগীকেই প্রতিদিন ২ থেকে ৩ ঘণ্টা করে অন্তত ২ দিন অপেক্ষা করতে হয় একবার ডাক্তার দেখাতে।

● ২৫ শতাংশ রোগী এক থেকে তিন সপ্তাহ হাসপাতাল চত্বরেই কাটাতে হয় কারণ তাঁদের যাতায়াতের সঙ্গতি নেই।

● এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৪৪ শতাংশ রোগী বলেছেন, তারা চিকিৎসকের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি এবং রোগের কারণ না জানায় চিকিৎসা করাতে পারেননি।

● জরুরি বিভাগে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আসা রোগীদের মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন।

যারা বলত শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে বিপ্লব—১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর কী পেলাম তাদের ৩৪ বছরের শাসনকালে?

পশ্চিমবঙ্গে ৭ বছরের উর্দ্ধে মানুষদের মধ্যে ৩১ শতাংশ নিরক্ষর। জেলায় জেলায় বৈষম্য ব্যাপক। উত্তর ২৪ পরগণায় সাক্ষরতার হার ৭৮ শতাংশ, আবার উত্তর দিনাজপুরে ৪৮ শতাংশ। এই রাজ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২০ জন দশম শ্রেণীর (মাধ্যমিক) পড়া শেষ করে। এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যান বলছে এই রাজ্যের ৮.৯৭ লক্ষ শিশু স্কুল শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। ২০০৯-এ ওই সংখ্যাটা খুব একটা পাল্টায়নি। বিহারে তপশিলী জাতি ও জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হয়, দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবার থেকে আসা শিশুরা স্কুলে উপস্থিত থাকলে প্রতিদিন ১ টাকা করে পায়, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ সরকার স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া দূর থেকে আসা মেয়েদের সাইকেল দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? ২০০৯ সালের হিসেব বলছে, এখনও ৩৭ শতাংশ বিদ্যালয় গৃহ জীর্ণ। একটিমাত্র শ্রেণীকক্ষ এমন বিদ্যালয় ২১ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল, বিদ্যুৎ নেই ৯১.৫ শতাংশ। মহিলাদের পৃথক শৌচাগার নেই ৮৪ শতাংশ। প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি ১৯৭৭ সালে দেওয়া হয়েছিল, ৩৪ বছরে তা পূরণ হয়নি। শিক্ষার আয়োজনে এইরাজ্য এখন ওড়িশা ও অসমের থেকে পিছিয়ে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের মোট সাক্ষরতার হার যেখানে ৬৯ শতাংশ সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪৩ শতাংশ। ক্ষমতায় এসে শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণের নামে প্রধান শাসকদল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে পরিচালন সমিতি পর্যন্ত পুরোপুরি দলের নিয়ন্ত্রণে আনে। নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সব কিছুই হয় দলের সুপারিশে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিবরণ	১৯৭৭-এর আগের সরকারগুলির আমলে	১৫.০১.০৯ পর্যন্ত বাম সরকারের আমলে	১৫.০১.০৭ পর্যন্ত সর্বমোট	১৫.০১.০৮ পর্যন্ত সর্বমোট	১৫.০১.০৯ পর্যন্ত সর্বমোট
	লক্ষ একর	লক্ষ একর	লক্ষ একর	লক্ষ একর	লক্ষ একর
সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কৃষিজমি চিহ্নিতকরণ, তা সরকারের অধিকারে আনা এবং 'খাস' ঘোষণা	১১.১২	১.৮৮	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে 'খাস' জমি বন্টন	৬.১২	৫.১৪	১১.১১	১১.১৯	১১.২৬
এ সংক্রান্ত মূল আইনগুলির প্রণয়ন	হয়েছে	হয়নি	—	—	—
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
অনথিভুক্ত বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তিকরণ (উচ্ছেদ সহ সর্বমোট)	৫.১৮	৯.৯৪	১৫.০৮	১৫.১০	১৫.১২
নথিভুক্ত বর্গাদার উচ্ছেদ	হয়নি	৪.৫৩	—	—	—
নিট নথিভুক্ত বর্গাদার (উচ্ছেদ বাদে)	৫.১৮	৫.৪১	১০.৫৫	১০.৫৭	১০.৫৯

(বি.দ্র. উপরের তালিকায় ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট বিবৃতিতে প্রস্তাবিত ৫.২৩৩ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে, কারণ ২০০৯-১০ অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতিতে এর কোনও প্রতিফলন নেই।)

পরিচালন সমিতিগুলি বিরোধীশূন্য করা হয়। ছাত্রসংসদগুলিও কার্যত একই দশাপ্রাপ্ত হয়। বামরাজত্বে এহেন শিক্ষানীতির ফলে কয়েক প্রজন্মের শিক্ষার্থীকুল না শেখে ইংরেজি, না বোঝে বাংলা।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকার ছিল ১৭ লক্ষ। ২০০৮ সালে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ৭৭ লক্ষ। ২০০৬ সালে ৪,৯৭,০০০ চাকরির জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন; কিন্তু চাকরি পেয়েছেন মাত্র ১৫,১০০ জন। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাজ পেয়েছে ১৫২৯ জন আর কাজ হারিয়েছে ৩,৮৯, ০৮৬ জন। ২০০৩ সালে রাজ্যে ৯১২০ জন কাজ পেয়েছে, কাজ হারিয়েছে ৬,৪৫,০০০ জন। সিপিএম-এর ২২ তম সম্মেলনের খসড়ায় বলা হয়েছিল— 'শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান'। সেই সময় বলা হয়েছিল হলদিয়ায় চাকরি পাবে দেড় লক্ষ মানুষ। কিন্তু হলদিয়ায় কত মানুষ কাজ পেয়েছিল? বিধানসভায় ২৮ নভেম্বর ২০০৮-এ পেশ করা সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির রিপোর্ট বলছে—'হলদিয়াতে কর্মসংস্থান হয়নি'। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মিলিয়ে ঘোষিত সংখ্যার এক দশমাংশেরও কর্মসংস্থান হয়নি। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে চাকরি পেয়েছে মাত্র ৬০০ জন। অনুসারী শিল্পে কাজ পেয়েছে আরও ষোলোশো মানুষ। দুর্গাপুরে নতুন কারখানা স্টলবার্গে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২০ জন। দুর্গাপুরে বারোটি সিমেন্ট কারখানায় মোট শ্রমিক সংখ্যা ৭০০। বাম সরকার বলছে—শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান হবে কিন্তু বামপন্থী অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়কের মতে—আজকের কর্পোরেট শিল্পায়ন জনবিরোধী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাতে কর্মসংস্থান হবে উৎখাত কৃষকের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। স্বয়ং অসীম দাশগুপ্তই বলেছেন—'উদার অর্থনীতির যুগে মানুষ কর্মসংস্থানহীন উন্নয়নের শিকার'। ১৯৮০-৮১ সালে এককোটি টাকা বিনিয়োগ করলে কর্মসংস্থান হোত ২২৮ জনের। এখন এককোটি টাকা বিনিয়োগ করলে তিন জনের বেশি কর্মসংস্থান হয় না। বর্তমান যুগে শিল্পপতিদের লক্ষ্য—লেবার সেভিং ক্যাপিটল ইনটেনসিভ' নীতির প্রয়োগ। ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ ভারতের শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ও অবদান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট শিল্পোৎপাদনে রাজ্যের কলকারখানার অংশ

স্বাস্থ্যসূচক	পশ্চিমবঙ্গে	ভারতবর্ষে	২৫টির মধ্যে রাজ্যের স্থান
শিশুদের রক্তাল্পতা	৭৮ শতাংশ	৭৪ শতাংশ	৯
মহিলাদের অপুষ্টি	৬৩ শতাংশ	৫২ শতাংশ	১৭
গড় উচ্চতা	১৫০ সেমি	১৫১.২ সেমি	২৩
গড় বিএমআই	১৯.৭ শতাংশ	২০.৩ শতাংশ	২২
স্বাভাবিকের চেয়ে কম বিএমআই	৪৩.৭ শতাংশ	৩৫.৮৯ শতাংশ	২৪
মহিলাদের রক্তাল্পতা	৬৩.২ শতাংশ	৫২ শতাংশ	১৯
পুরুষ ও মহিলাদের মাঝারি ও তীব্র রক্তাল্পতা	৬২.৭ শতাংশ	৫১.৮ শতাংশ	২০

স্বাস্থ্যসূচক	সেরা রাজ্যের হার	পশ্চিমবঙ্গের হার	পশ্চিমবঙ্গের স্থান
জন্মহার	১৭.৯	২২.৭	নবম
মৃতুহার	৬.০	৮.৩	অষ্টম
উর্বরতা হার	২.০৭	২.৪৯	নবম
সদ্যোজাত শিশুমৃতুর হার	১৩.৮৬	১৩.৯	সপ্তম
শিশুমৃত্যু হার	১৬.৩০	৪৮.৭	একাদশ

ধর্মঘট ও লকআউটের খতিয়ান

সাল	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট	লকআউট	লকআউটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট
২০০২	৩০	১.১৯	৩৪৬	২০.৬৮
২০০৩	৩২	১.৬৫	৩৫১	২৪.৮১
২০০৪	২০	১.৬৬	৩৬৪	২৪.৩৮
২০০৫	২৬	৩.১১	৩৫৭	২২.৩৩
২০০৬	৯	.২৪	২৬৫	১৮.৭৫
২০০৭	১১	১৩.৩৫	২৭৬	১৭.১৪
২০০৮	১২	৩.৮০	২৬০	১৫.৭০
২০০৯	১০	৩.৯৬	২৬৩	১৫.২৫
		সংখ্যা মিলিয়নে		সংখ্যা মিলিয়নে

ছিল ১০.৫ শতাংশ। আজ দেশ যখন মুক্ত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছে তখন জ্যোতি বুদ্ধের হাতযশে এটি নেমে দাঁড়িয়েছে ৪ শতাংশে। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট রেজিস্টার্ড কারখানা ছিল ৫৪৬৯ টি। এতে প্রায় ৯ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ কর্মরত ছিল। ২০০১ সালে কারখানা বেড়ে ৬০৯১ হলেও কর্মরত কমে হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। এর মধ্যে ২৫২টি রুগ্ন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭ সালে ধর্মঘট হয়েছিল ২০৬ এবং লকআউট ১৯১। ২০০০ সালে ওই পরিসংখ্যান গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মঘট ২৭ এবং লকআউট ২৮০। পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গে এখন আর শ্রমিক আন্দোলনে কারখানা বন্ধ হয় না, হয় লকআউটে। নিন্দুকেরা বলছেন, এমন 'মালিক দরদী সরকার' সারা ভারতে একটিও নেই!

১৯৯১ সালে আগস্ট মাস থেকে ২০০৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতে মোট লগ্নি প্রস্তাব এসেছে ৪৪,০২,৭৮৬ কোটি টাকার। এতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রস্তাব ২,৪২,৩৭০ কোটি টাকার যা মোট বরাদ্দের ৫.৫ শতাংশ। আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত মোট অর্থের ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত লগ্নি বাস্তবায়িত হয়ে মাত্র ৩২,৬৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার। ২০০৯-এর পর এই লগ্নি আরও কমেছে। রাজ্যে কর্ম-সংস্থানের এমনই হাল, গ্রামবাংলায় দৈনিক ১২ টাকাও রোজগার করতে না পারা মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। গ্রামে ১,৩৩,৯৩,৫৩০টি পরিবারের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে ৪৫,৬৯,৮৩৪টি পরিবার। গৃহহীন ৫,৭৭,৮১৯টি পরিবার; ভূমিহীন ৭৫,৭৯,৪৩৯টি পরিবার। কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে দৌঁড়ায় ২,০৯,৯৫০টি পরিবার। উপরিউক্ত তথ্যাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক উন্নতি কিছুই ঘটেনি। কোনও বড় শিল্পও গড়ে উঠেনি। তেমন উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। এলোমেলো ভাবে কিছু প্রকল্প যার বেশিরভাগই শিল্পপদবাচ্য নয়। তাকেই শিল্পায়ন বলে চালানো হচ্ছে। যেমন উপনগরী, ফুডপার্ক, আই টি হাব, প্রমোদকানন, উড়ালপুর ইত্যাদি। শিল্পনগরী কি একই বর্গভুক্ত? আর উপনগরী তো স্রেফ প্রমোটারি। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রমোটার রাজকেই শিল্পায়নের নামে অভিহিত করা হচ্ছে। আর এই ভুয়ো শিল্পায়ন নিয়েই কি ভোট আদায় সম্ভব?

পরিবর্তন কেন?

- প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা ৩৫-এ ৩৩তম। ঝাড়খণ্ডের ঠিক উপরে।
- প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের মধ্যে স্কুলছুট ৭৮.০৩ শতাংশ। মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, সিকিমের পরে। স্কুলছুট রোধে ব্যর্থ প্রধান পাঁচটি রাজ্যের একটি এই রাজ্য।
- শিশু মৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সারিতে।
- নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম।
- নারীধর্ষণ ও নারী পাচারে ভারতের সর্বোচ্চ দুটি জেলা পশ্চিমবঙ্গে।
- এরাজ্যে মাত্র ২৭.৯ শতাংশ পরিবার পরিশ্রুত পানীয় জল পায়।
- রাজ্যে নথি ও অনথিভুক্ত রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪৬। দেশের মোট রুগ্ন সংস্থার ৪৮.৬ শতাংশ এই রাজ্যে।
- মাথাপিছু মোট উৎপাদনের (জি ডি পি) নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে ১৮তম রাজ্য।
- এরাজ্যে গড়ে প্রতি দশজন মানুষের মধ্যে একজন অভুক্ত থাকেন। আর আধপেটা খেয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় ওড়িশার সাথে রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে। শহরে অনাহারে থাকার বিচারে এরাজ্য প্রথম।
- রাজ্যের ৩৪১টা ব্লকের মধ্যে ১৪৭টা ব্লকে অর্ধেক সময় কোনও খাবার জোটে না।
- রাজ্যের জি ডি পি-র মাত্র ০.৮৭ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ।
- প্রতি ৩.২ গ্রামে একজন চিকিৎসক। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে একজন গ্রামীণ মানুষকে গড়ে ৪ কিলোমিটার হাঁটতে হয়।
- শিশুদের রক্তাল্পতার আধিক্যে ২৫ প্রধান রাজ্যের মধ্যে এইরাজ্য ১৯তম স্থানে।
- গ্রামবাংলায় ৫৫ শতাংশ বাড়ীতে শৌচালয় নেই। ৪৭ শতাংশ বাড়ীতে (গ্রাম ৬৫ শতাংশ, শহর ৩০ শতাংশ) আজও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি।
- রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ১৩০টির ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক বা ফ্লুওরাইডে বিষাক্ত। ওই জল ব্যবহার করেন ৩ কোটি মানুষ।
- শ্রমিকদের পি এফ এবং ই এস আই এর টাকা মেরে দেওয়ায় এরাজ্য প্রথম।
- রাজ্যে নথি ও অনথিভুক্ত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪৬। দেশের মোট রুগ্ন সংস্থার ৪৬.৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত। মোট সংস্থা যত তার ৪২.২ শতাংশ অর্থাৎ ২৯,২১৫টি সংস্থা বন্ধ। কাজ নেই তিন লক্ষ মানুষের।
- রাজ্যের জনসংখ্যা ৮ কোটি ২ লক্ষ। কাজ করে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন।
- প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতন পান না। ৭৩ লক্ষ খেতমজুর। এর মধ্যে ১০ লক্ষ ইটভাটা শ্রমিক, ১৫ লক্ষ বিড়িশ্রমিক, ১১ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি।
- সারা দেশের মধ্যে শ্রমিক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। অথচ লেবার কোর্টের সংখ্যা মাত্র ১১টি।
- শ্রমিকদের পি এফ বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। চটশিল্পে শ্রমিকদের শুধু গ্রাচুইটি বাবদ বকেয়া ২৫০ কোটি টাকা। এরমধ্যে এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষে অবস্থান করছে বহু বছর।
- সাধের সেক্টর ফাইভে বহুল প্রচলিত কাজ করতে হয় ১২ ঘণ্টা। কাজের সময় মাইনে নিয়ে কোনও কথা বলার অধিকার নেই।

প্রমীলা রাজ্য

মেয়েদের মতোই মাথায় ঘোমটা। আসলে এরা পুরুষ। খাসি জনগোষ্ঠীতে প্রমীলা রাজে এভাবেই তটস্থ পুরুষেরা।

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বুঝি প্রকৃতিরই উলট্‌পুরাণ। সারা দেশেই মেয়েদের সংখ্যা কমছে। বাড়ছে কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা। মেয়েদের ওপর আকছারই ঘটছে জঘন্য সব অত্যাচারের ঘটনা। ফলত, নারীবাদী চিন্তা-ভাবনা বিকাশের একটা পটভূমি রচিত হয়ে রয়েছে আগাগোড়াই। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের যে অঞ্চলটি সবচেয়ে উপেক্ষিত তা নিঃসন্দেহে উত্তর-পূর্ব ভারত। আপাদমস্তক পার্বত্য এলাকা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গিরা এখানেই খুঁজে নিয়েছে তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এত বঞ্চনা'র মাঝেও অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা উত্তর-পূর্বে বহু জনজাতি সম্প্রদায়ের বাস। এরকমই একটি সম্প্রদায় হলো খাসি জনগোষ্ঠী।

খাসি জনগোষ্ঠীর বাস মূলত মেঘালয়ে। আমাদের যেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তেমনি মেঘালয়ের সমাজব্যবস্থা নারীতান্ত্রিক। এখানকার নারীতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই মিথে পরিণত। রূপকথায় পর্যবসিত। তবে মেঘালয়ের খাসি সম্প্রদায় সেই মিথকেই জীবন্ত করে তুলেছে, টেনে এনেছে বাস্তবের মাটিতে। খাসি পরিবারে ছেলের জন্ম কোনও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে না। সেটা নিয়ে আসে মেয়ের জন্ম। খাসি পরিবারের সন্তানেরা মায়ের পদবী-ই গ্রহণ করে, বাবার পদবীর পরিবর্তে। সম্পত্তির ওপর ছেলেদের কোনও অধিকার নেই, কনিষ্ঠতমা কন্যাই 'মায়ের সম্পত্তি'র উত্তরাধিকারিণী হন। এমনকী, কোনও পরিবারে উত্তরাধিকাররিণী খুঁজে না পাওয়া গেলে, অবশ্যই কোনও মেয়েকে দত্তক হিসেবে সেই পরিবারে ঠাঁই দিয়ে তার হস্তেই যাবতীয় পারিবারিক সম্পত্তি সঁপে দিয়ে যেতে হবে। বিয়ের পর বেচারা বরটিকে কনের বাড়িতেই চলে যেতে হয় মা, বাবা, ভাই বোনেদের ফেলে। শাশুড়ির হুকুমেই বাকি জীবনটা শ্বশুরবাড়ির থুড়ি শাশুড়িবাড়ির অন্দরেই কেটে যায় তার। পারিবারিক যে কোনও ব্যাপারে ছেলেদের কথা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না, মেয়েরাই সেখানে সর্বেসর্বা।

নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং ভারতবর্ষের নারীদের জাগরণে এটা যুৎসই উদাহরণ হিসেবে আগামীদিনে নিশ্চয়ই উঠে আসবে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখা দরকার যেমন পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর অধিকার রক্ষায় এখানে আন্দোলন হয়, তেমনি মেঘালয়ে খাসি সম্প্রদায়ের ভেতর নারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরুষের অধিকার রক্ষায় সেখানে শুরু হয়েছে আন্দোলন। Syngkhong Rympei Thymmai নামে 'পুরুষবাদী আন্দোলন'-এর সূচনা হয়েছে সেখানে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেইথ পরিয়াত নামে জনৈক ব্যক্তি। সবমিলিয়ে সারা ভারতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষদের যে রমরমা, মেঘালয়ে খাসি সম্প্রদায়ের চিত্রটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে যা, ওখানে ঠিক তার উল্টোটা। একটু অন্যরকম, না?

পুরুলিয়ায় বি পি এল কার্ডও বিক্রি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের দাপাদাপি। সর্বশেষ লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে এরাজ্যের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত জেলা পুরুলিয়ার জঙ্গলে। মাওবাদীরা অপহৃত এক গোয়েন্দা এবং একজন স্কুল শিক্ষককে হত্যা করেছে। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, জনজাতি অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করেই মাওবাদীরা এরাজ্যে তাদের সাংগঠনিক ভিত-কে শক্ত করেছে। গরীব, বেকার জনজাতি যুবকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অলীক রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে মাওবাদীদের সশস্ত্র বাহিনী 'পীপুলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মি'-তে ভর্তি করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সুদীর্ঘ বামশাসনের বীভৎস ও অনুন্নয়নের করাল স্বরূপটা নগ্ন করেছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ি থানার আমলাসোল গ্রামের অনাহারে মৃত্যুর খবরটা। যা কলকাতার বিভিন্ন ছোট-বড় দৈনিকে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জেলাগুলির অনুন্নত গ্রামের সমীক্ষা করায় বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে দিয়ে। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল রাজ্যের অনধিক ৩৬ হাজার গ্রামের মধ্যে চার হাজারের কিছু বেশি গ্রামে উন্নয়নের কোনও আলোই পৌঁছায়নি। সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ গ্রামের সংখ্যায় এগিয়ে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা। ১২০০-র কাছাকাছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈদ্যুতিক আলো এবং পাকা রাস্তার কোনও নামগন্ধ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ।

পুরুলিয়া জেলায় এতদিন পর্যন্ত বিধানসভার আসন সংখ্যা ছিল ১১টি। এবার পুনর্বিন্যাসের কারণে কমে হয়েছে ন'টি। গত ৩০ বছর ধরে এগারোটির মধ্যে নয়টি আসনই বামফ্রন্টের দখলে রয়েছে লাগাতার ৩৪ বছর। ব্লকের সংখ্যা কুড়িটি। ২০০১-এর জনগণনায় মোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের কিছু বেশি ছিল। প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দুজনই তথাকথিত 'দলিত এবং জনজাতি'। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা ৫৫ জন বালক সাক্ষর। কিন্তু বাস্তবে এটা ডাহা মিথ্যা। এই দু'জনই দু'বেলা দুমুঠো খাবার পেতে চাতকের মতো অপেক্ষা করে। এই শিশু-বালকদের শতকরা ৯০ জনই গ্রামে বসবাস করে। জেলার একতৃতীয়াংশ এলাকাই জঙ্গল। বর্তমানে নয়টি বিধানসভার তিনটিই মাওবাদী হিংসা কবলিত। রয়েছে সিপিএম সমর্থক হার্মাদবাহিনী এবং মাওবাদীদের সমর্থক জনজাতিদের একাংশ। একে অপরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার শানাচ্ছে, বদলা নিতে। গত বছর ১৭ ডিসেম্বর একইদিনে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাতজন ক্যাডারকে একসঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল।

২০১০ সালে একটি ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস) সমীক্ষামূলক সংবাদ অনুসারে সরকারি চাকরি করা লোকেরাও বি পি এল কার্ড পান। অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত দুবেলা অন্ন জোটে না এমন প্রান্তিক কৃষকও জমি আছে বলে বি পি এল কার্ড পান না। এক এক জায়গায় শাসক দলের মর্জিমাফিক বি পি এল কার্ড পাওয়ার মাপকাঠি এক এক রকম। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন গ্রামে বি পি এল কার্ড কিনতে হয় টাকা দিয়ে। যেমনটা ঘটেছে আরসা ব্লকের ছাতুহানসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে। ওই পঞ্চায়েতে গ্রামের সংখ্যা ২৫টি। গড়ে গ্রাম প্রতি ৫০/৬০ পরিবার বসবাস করে। সরকারি হিসেবে গ্রামের শতকরা ৮০ শতাংশ পরিবারকে বি পি এল-কার্ড বন্টন করা হয়েছে। অথচ উপরোক্ত পত্রিকার সরেজমিন সমীক্ষায় গ্রামপ্রতি ২/৩ জন-ই বি পি এল কার্ড পেয়েছেন। অন্যরা নাকি এ পি এল তালিকায় পড়েন। অথচ বেশির ভাগ গ্রামবাসীর মাসিক আয় ৫০০ টাকার কম। এলাকার নালাকুছা গ্রামের পরিবার সংখ্যা চল্লিশ। একজনের বি পি এল কার্ড রয়েছে। গ্রামেরই ঘনিরাম মাঝির কথায়— ''পঞ্চায়েত প্রধানের কথা মতো ১২০০ টাকা দিয়ে বি পি এল কার্ড কিনতে হোত। তবে বাবা সিপিএম নেতা বলে ৫০০ টাকা কম অর্থাৎ ৭০০ টাকা দিয়ে বি পি এল কার্ড পেয়েছি।'' ২০০৫-এ ছাতুহানসা'র পঞ্চায়েত প্রধান যমুনা মাঝির নির্দেশমতো টাকা দিয়ে বি পি এল কার্ড কিনতে পাওয়া যেত। কুমীরডিহা গ্রামের বাবুরাম মাহাতোর ছেলে সুনীল মাহাতো এক হাজার টাকা দিয়ে তখন বি পি এল কার্ড পেয়েছে। কুমীরডিহা গ্রামের অনেক গরীবের তো বি পি এল-কার্ড-এ রেশন তোলার আর্থিক সামর্থ্য নেই। সেক্ষেত্রে কার্ড বিক্রি হয়ে যায়। দোতলা বাড়ির মালিক অমরনাথ মণ্ডলেরও বি পি এল কার্ড আছে। ছাতুহানসার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান যমুনা মাঝি ১৯৯৮-২০০৬ পর্যন্ত পঞ্চায়েত চালিয়েছেন। অবশ্য যমুনা নিজে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আরসা ব্লকের বিডিও সুবর্ণ রায় বি পি এল কার্ডে গরমিলের কথা মেনে নিয়ে বলেছেন— ''আমরা যে তালিকা করেছি আর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ যে তালিকা তৈরি করেছে তাতে পরস্পর ফারাক আছে। তবে গ্রামবাসীরা কোনও লিখিত অভিযোগ জানায়নি।'' এভাবেই জেলা জুড়ে দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান। একইরকম নিজ নিজ এলাকায় বহাল তবিয়তে রয়েছে শাসক দলের মদত পুষ্ট হার্মাদ বাহিনী এবং মাওবাদীরা। দুইয়ের মাঝে চিঁড়েচ্যাপ্টা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় গরীব সাধারণ মানুষ।

নীরব সন্ত্রাস সরবে বর্তমান

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সি পি এম দলের আচার আচরণে ক্রমশই একটা সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে। বরাবরের সন্ত্রাসে অভ্যস্ত দলের কাছে তা যেমন অস্বস্তিকর তেমনই বিড়ম্বনার। পঞ্চায়েৎ, লোকসভা, পুরভোট ও বহু স্কুল কলেজ, সমবায়গুলিতে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর দলের নেতারা নানান বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা করে বিবিধ নিদানও বাতলাচ্ছেন। কেউ বলছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাও। ব'ল, ভুল হয়েছে। কেউ বলছেন আর জমি-টমি নেওয়া হবে না যা পক্ষান্তরে শিল্প স্থাপনকে চুলোর দোরে পাঠানোর নামান্তর মাত্র। ভাবলে অবাক হতে হয় যে শত সহস্র কমরেড বগলে ফোঁড়া হলে যেমন দু'হাত বিশেষ কায়দায় পৃথক করে মানুষকে হাঁটা-চলা করতে হয় সেই পোজে চলা দাম্ভিক, সর্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া লোকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোষ স্বীকার করছেন। দল এত সব করতে রাজী কিন্তু ক্ষমতা ছাড়ার কথা দূরতম স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না। অথচ দেখুন গণতন্ত্র বলবৎ থাকা একটি দেশে সেটিই স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষ কোনও দলের শাসন প্রক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট হলে ভোট বাক্সে তার প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত করবে। চিরকালীন ভোটার লিস্ট থেকে ফলস্ ভোট, ছাপ্পা ভোট, গণনায় জালিয়াতি করে ক্ষমতা ভোগে অভ্যস্ত দলটি কিছুতেই বাস্তবকে মেনে মানুষের রায় মাথা পেতে নিতে রাজী নয়। যদিও দেওয়ালের লিখন প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই এর থেকে পরিত্রাণ পাবার নানান রকম পরীক্ষা নিদানের ওপর ভরসা করে দল নিচু তলার কমরেডদের চাঙ্গা করে রাখতে চাইছে।

যিনি চীনে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে অন লাইন সওয়াল করেছিলেন তাঁকে ১০ বছরের জন্য জেলে কাটানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। লিউ বলেছেন তিনি দশ বছর ধরে তো জেলের অভ্যন্তরেই কাটাচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁর কমপক্ষে ২০ বছর জেল মেয়াদ হয়ে গেল। ধন্য চীন সরকার!

লিউ জিয়াওবো

বাংলায় একটা চালু কথা আছে 'জাতে মাতাল তালে ঠিক'। এতসব বিচার বিশ্লেষণ করে স্টার কমরেড, হাফ স্টার কমরেড, হেভিওয়েট কমরেড, পলিটব্যুরোর বিশেষ কমরেডরা গাড্ডা থেকে বেরোনোর বিবিধ টোটকা দিলেও সযত্নে কিন্তু মূল জিনিসটি থেকে দূরে থেকে যাচ্ছেন। তা হলো সশস্ত্র সন্ত্রাসের পাশাপাশি সবথেকে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা সন্ত্রাস। প্রশাসনকে ব্যবহার করে, থানাকে কব্জা করে হাজার হাজার মানুষকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো। প্রতিপক্ষকে খুন দাঙ্গায় নিঃশেষ করা যতদূর সম্ভব করে আরও অসংখ্যকে সাজানো মামলায় জড়িয়ে দিন, মাস, বছর কাটিয়ে দিতে পারলে বিরোধী পক্ষই জন্মাবে না। দলের এই বহু পরীক্ষিত পন্থাই কিন্তু পুরোদমে আজকের তারিখেও চলছে। প্রমাণ গত ৪.৪.২০১১ তারিখের আনন্দবাজার রয়েছে—'নেতাই কাণ্ডের সাক্ষীদের নামে ভুয়ো মামলা' শীর্ষক সংবাদে। নির্বাচন কমিশন, সি বি আই— এতগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তা সত্ত্বেও স্থানীয় পুলিশের যোগসাজসে দল নেতাইয়ের নৃশংস গুলি চালানার প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয় দেখিয়ে মিথ্যে মামলা চাপিয়ে এত বড় গণহত্যার ঘটনাকে হজম করে ফেলার দুঃসাহস এখনও দেখাচ্ছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে সাক্ষীদের ওপর তারা অপহরণের মামলা দায়ের করছে। সেই এফ আই আর দাখিলকারী---আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে অপহরণ করা হয়নি। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে ক্ষমতা, মিথ্যাচার মানুষকে পশুত্বে নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে এই দল যে কতটা নিষ্ঠুর ও নৃশংস হতে পারে—এ ঘটনা তারই একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে, সাধারণ মানুষ এতে হতবাক হলেও এই রাশিয়া-চীনের ঔরসজাত কম্যুনিস্ট দলের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘৃণ্য পরম্পরারই প্রসার মাত্র। বিনা বিচারে খুন, মাস মার্ডার, আটক-স্ট্যালিন জমানায় জলভাত ছিল তা সকলেরই জানা। যে নোংরা ইতিহাস আলোচনার দরকার নেই। সোভিয়েত পতনের পর সেই দায়ভার এখন কৃতজ্ঞচিত্তে চীন বহন করছে। দেশের নাগরিকদের বিরোধী কণ্ঠীকে স্তব্ধ করতে সিপিএম দলের ধাপ্পাবাজির সাম্প্রতিক কয়েকটি আচরণ তুলে ধরলেই এই শাসন নিরুপদ্রব রাখতে বিনা বিচারে প্রতিপক্ষকে জেল খাটানোর সংস্কৃতিটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(১) ২০১০ সালে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় নোবেল পুরস্কারের (শান্তি) জন্য চীনের মানবাধিকার কর্মী জিয়াওবো মনোনীত হলেও চীন সরকার তাঁর ক্রিয়াকর্মকে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁকে আগেই জেলে পুরে দেয় (জিয়াওবো ১১ বছর জেল খাটছেন বিচার কবে শেষ হবে কেউ জানে না)। পুরস্কার আনতে যদি তাঁর স্ত্রী চলে যান, সেই কারণে পুরস্কার ঘোষণা হওয়া মাত্রই তাঁকেও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের অপরাধ ছিল একদলীয় শাসন ব্যবস্থার চরম আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কথা বলা। কোনও খুন, রাহাজানী, দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র সেসব কিছু নয়।

(২) গত ২৬.৩.১১ দি টেলিগ্রাফ-এ প্রকাশ লিউ জিয়াওবো, যিনি চীনে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে অন লাইন সওয়াল করেছিলেন তাঁকে ১০ বছরের জন্য জেলে কাটানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। লিউ বলেছেন তিনি দশ বছর ধরে তো জেলের অভ্যন্তরেই কাটাচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁর কমপক্ষে ২০ বছর জেল মেয়াদ হয়ে গেল। ধন্য চীন সরকার! এই সংস্কৃতিরই প্রত্যক্ষ ধারক ও বাহক আমাদের রাজ্যের শাসক দল। দলীয় কার্যালয়ে গেলে এইসব মহান রাশিয়ান-চীনা শাসকদের প্রতিকৃতি সকলে অবশ্যই দেখতে পাবেন।

(৩) ইন্টারনেট খুলে চীনের জেল সংক্রান্ত

তথ্যাদি অনুসন্ধান করলে কিছু কিছু ভয়ঙ্কর তথ্যাদি পাওয়া যাবে। সেখানে Black Jail বলে একটি বস্তু চালু আছে। এটি কিন্তু সরকার পরিচালিত স্বীকৃত জেলখানা নয়। যেমন ব্ল্যাক মার্কেট, ব্ল্যাক ম্যাজিক এরকম আর কি স্থানীয় পার্টি প্রশাসন স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে কব্জা করে নেওয়ার পদ্ধতি চালু থাকায় আবার কেউ কেউ ন্যায় বিচারের আশায় 'পিটিশনিং' বলে যে ব্যবস্থা চালু আছে তার সাহায্য নিতে চান। এই পিটিশনিং-এর অফিসগুলি বড় শহরেই মূলত থাকে। গেঁয়ো মানুষজন যখন দরখাস্ত জমা দিতে এই সব শহরে আসেন তাঁদেরকে আদর করে কোনও স্কুল, পুরনো হোটেল বা পরিত্যক্ত অফিসবাড়ী—অবস্থা বিশেষে যা পাওয়া যায় ইত্যাকার জায়গায় রাখা হয়। বলা হয় সময়মত ঠিক জায়গায় তাদের পিটিশন পৌঁছে দেওয়া হবে। যা আদতে কখনওই করা হয় না। বদলে শুরু হয়— বেদম মারধোর ও যৌন অত্যাচার।

এগুলির পোশাকী নাম নিরাপত্তা সংস্থা আসলে সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় এগুলি 'বেআইনী জেল'। নিচের তলার অত্যাচারী কমরেডরা যাতে কোনওভাবেই ওপর তলার নজরে না আসতে পারেন সেই জন্য আইনী পথে বিশ্বাস রেখে আসা নিরপরাধ মানুষজন 'বেআইনী' জেলের মধ্যে পচে জীবন কাটান। অসাধারণ ও অভূতপূর্ব এই অধ্যায় বিপুল সে পরিসর এখানে নেই। শুধু আশঙ্কা, এই নেতাই কাণ্ডে সাদা কাগজে সই করিয়ে নির্দোষ সাক্ষীদের ভয় দেখাতে যে অপহরণের মামলা-খেলা শুরু হয়েছে এই সিপিএম দল সাধের অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করলে হয়ত আরও এগিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে ওই Black Jail ব্যবস্থার দিকেই যাবে। এ প্রসঙ্গে এক টিভি সাক্ষাৎকারে মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্রের একটি কথা মনে পড়ে। থানায় আসা নিরপরাধ মানুষকে পার্টির দাদা আর পুলিশ সমস্বরে বলছে ''কেস তোকে খেতেই হবে। এখন বল্ কি দোব— চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ না খুন"। ধম্মোবাপের সার্থক অনুসরণ।

সূত্র—টেলিগ্রাফ-২৮.৩.১১

এ কোন্ পরিবর্তন?

দেগঙ্গার রক্তস্নান, রাজীবের আত্মাহুতি—সম্মান বাঁচানোর এ দুই লড়াইয়ের পর তৃণমূলীয় উল্লাস লক্ষ্য করা গেল। লাশ নিয়ে রাজনীতি করার খেলায় জয়ী হওয়ার তাগিদে রাজীবের লাশকে রাজনীতির মোড়কে ঢাকতে 'বেগম সাহেবা'র কী নির্লজ্জ প্রচার। দিদির সম্মান বাঁচাতে যে রাজীব আত্মবিসর্জন দিল সে নাকি তৃণমূল দলের সম্মান রক্ষার মূর্ত প্রতীক! আবার ওদিকে দেগঙ্গায় সম্ভ্রম হারানো হিন্দুদেরকে যে সব মুসলিম তছনছ করে দিয়ে গেল সেসব মুসলিম নাকি তৃণমূলীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। রাজনৈতিক নেতাদের অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে বারাসাতবাসী প্রমাণ করেছে যে তারা সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খুঁজতে নারাজ।

দেগঙ্গার হিন্দুরা দুর্গাপূজা বন্ধ রেখেছে, রাজীবের বন্ধুরা তাঁর পবিত্র মৃতদেহকে রাজনৈতিক পতাকা থেকে রক্ষা করেছে, কলকাতাবাসী বেগমের প্রিয় পাত্র রুকবানুর রহমানকে ভোটে হারিয়েছে। এখানকার লোকজন প্রমাণ করেছে তারা সুবিবেচক। তাইতো আশা জাগে দেগঙ্গার হিন্দুদের মতো, বারাসাতের প্রতিবাদী জনতার মতো আমরাও মেঠো-রাজনীতি প্রতিহত করতে পারব...।

২০১১-এর কাল মহাক্রান্তিকাল। এ কাল পরিবর্তনের কাল। কিন্তু কোন্ পরিবর্তন! চোর পাল্টে ডাকাতের ক্ষমতায়ন? তথাকথিত পরিবর্তনপন্থীদের চোটপাট আস্ফালন দেখে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তাদের 'দেখে নেব' ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে ভয় লাগে। মনে স্থির বিশ্বাস জাগে আসুরিক শক্তি রাজ্যের ক্ষমতায় আগতপ্রায়! পরিবর্তন রাজ্যবাসী ঠিকই চেয়েছিল—এখনও চায়। কিন্তু সে পরিবর্তন মানসিকতার পরিবর্তন। কিন্তু সাম্প্রতিক বাতাবরণ রাজ্যবাসীর সে চাওয়াকে শঙ্কিত করছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় রাজ্যবাসীর 'পরিবর্তন ভাবনা' এখন বারে বারে হোঁচট খাচ্ছে। 'পরিবর্তন' ভাবনায়ও খানিক 'পরিবর্তন' আসছে, এমনকী আনতে হবেও। একটি প্রবাদ মনে পড়ে 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হলো তার এঁড়ে কিনে'। আমাদের 'পরিবর্তন ভাবনায়' একটি প্রশ্ন উঁকি দেয় আমরা 'তাঁত' বুনেই খাব নাকি এঁড়ে কিনে এনে সর্বনাশ করব। সাম্প্রতিক 'বারাসাত কাণ্ড' পরবর্তী 'লাল-সবুজের কেত্তন' এবং তার জেরে বারাসাতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আমাদের আশা জোগায়, তথাকথিত লাশ রাজনীতির ধারক 'পরিবর্তনপন্থী'দের পরিবর্তন করার কথা ভাবায়—আমরা আশান্বিত হই। হিন্দুদের বুকের উপর চেপে বসে যারা মাদ্রাসার প্রসারের মাধ্যমে জঙ্গী তৈরির কারখানা স্থাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা অভিজাত হিন্দু পিতাকে অপমান করে—যারা হিন্দু মেয়েকে ফুসলিয়ে কোন গলির লম্পট বিধর্মী যুবকের ঘরে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে ইন্ধন জোগায়—যারা সেই লাম্পট্যকে উৎসাহিত করতে 'বিধায়ক' বানানোর স্বপ্ন দেখে—তাদেরকে নিশ্চয়ই বাংলার ভোটারকুল ক্ষমতাসীন দেখতে চায় না। এ রাজ্যের মানুষ 'অপদার্থ' নয়—মূর্খ নয়। কলকাতার ৫৯নং ওয়ার্ডই তার প্রমাণ রেখেছে। আমরা ভরসা পাই।

—অপরাজিতা দেবনাথ, কালিয়াগঞ্জ-উত্তর দিনাজপুর

সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ডঃ ইউনুসের টাকা!

একেই বলে বোধহয় 'সর্ষের মধ্যে ভূত'। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জনক ডঃ মহম্মদ ইউনুস দীর্ঘদিন ছিলেন ওই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭০। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের আইনানুসারে অবসরের বয়স ৬২। তাই তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক বরখাস্ত করেছে। এর বিরুদ্ধে ইউনুস হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানালে হাইকোর্ট বরখাস্তের নির্দেশ বহাল রেখেছে। তাই ইউনুস গিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেও একই রায়।

ইতিপূর্বে ইউনুসের বিরুদ্ধে উঠেছে আর্থিক দুর্নীতিসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ঋণগ্রস্তদের সর্বস্বান্ত করার অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, নরওয়ের দেওয়া ১০ কোটি ক্রোনারের অনুদান গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে খরচ না করে অন্য প্রকল্প— গ্রামীণ কল্যাণ প্রকল্পে সরিয়েছেন। এতে শুরু হয় হইচই। তাই সরকার দেয় তদন্তের নির্দেশ। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা পেয়েছেন এমন কিছু তথ্য, যা চমকে ওঠার মতো। সেই ১০ কোটি ক্রোনারের একটা অংশ (১৩ কোটি বাংলাদেশি টাকা)-এর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। ইউনুসও এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে গোয়েন্দারা মনে করছেন, ওই টাকা চলে গেছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হরকত উল জেহাদ, হুজি, আল কায়দা ইত্যাদির হাতে। সম্প্রতি হাসিনা সরকারের কাছে গোয়েন্দা বিভাগ যে দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে রয়েছে ইউনুসের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগের এবং বহু বিস্ফোরক তথ্য পেয়েছে। প্রকাশ শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে বি ডি আর (বাংলাদেশ রাইফেলস্) বিদ্রোহ ঘটেছিল, তার পিছনেও ছিল হুজির মদত ও ইউনুসের টাকা। ইউনুসের কুকীর্তির এখানেই শেষ নয়। একদা ইউনুস প্রণীত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প তথা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং তার জনকরূপে ইউনুস পেয়েছিলেন বিপুল প্রচার। বাংলাদেশের দরিদ্র নারী-পুরুষদের স্বনির্ভর হয়ে উঠতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অবদানের কথা সারা বিশ্বে হয়েছিল প্রচারিত। সেই প্রচারের সুবাদে ডঃ মহম্মদ ইউনুস পান অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার। কিন্তু সেই প্রচার যে ছিল প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী তা প্রমাণ হতে বেশি সময় লাগেনি। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৩ শতাংশ সুদে বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল অর্থ এনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে সেই টাকা গরিব নারী-পুরুষদের ঋণ দেওয়া হয়েছে ৪০-৫০ শতাংশ সুদে। ফলে, অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে হয়েছেন নিঃস্ব। অনেকে করেছেন আত্মহত্যা। এমনকী ঋণ-খেলাপীদের উপর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লোকজন চালিয়েছে অমানুষিক অত্যাচার। তাছাড়া নারী স্বনির্ভরতার জন্য 'হিলারি আদর্শ প্রকল্প' (মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিন্টন)-এর নামে গড়ে তোলা প্রকল্পের ঋণের দায়ে নারীরা হয়েছেন কাঙাল। বহু মেয়ের ঠাঁই হয়েছে দেশ-বিদেশের যৌনপল্লীতে। অনেকে হয়েছে আত্মঘাতী। আবার 'গ্রামীণ'-এর তৈরি মিষ্টি দইয়ে ইদানীং ধরা পড়েছে ভেজাল। পশুখামার ও আদর্শ গুচ্ছগ্রাম গড়ার জন্য এরশাদ সরকারের দেওয়া ৩০০০ একর জমি এখনও পড়ে রয়েছে খালি। এসবই গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে।

আমারিকার ৯/১১-র কাণ্ডের পর আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি ইসলামিক দুনিয়ায় এমন একজন উজ্জ্বল ভাবমূর্তির লোক খুঁজছিল, যাঁর ভাবমূর্তি কাজে লাগতে পারে। তারা পেয়ে যায় ডঃ ইউনুসকে। আন্তর্জাতিক স্তরের বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী নেতার সঙ্গে ঢাকায় গোপনে তাঁর বৈঠকও হয়েছে। ওই সময় বাংলাদেশে 'তবলীগ ই জামায়েত' নামে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ডঃ ইউনুসের বিপুল গুণকীর্তন করা হয়। আর তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে সেই থেকে। অতঃপর হাসিনা সরকারের নির্দেশে তাঁর কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্প্রতি গোয়েন্দারা তদন্ত করতে নেমে পান 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে'-র খোঁজ। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও তার জনক ডঃ ইউনুসকে নিয়ে বাংলাদেশে তথা দেশে-বিদেশে দীর্ঘদিনের উন্মাদনা ও প্রচারের ঢাক অবশেষে গেছে ফেটে। মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ইউনুস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি

বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক)-এর আসল পরিচয়। সেবা ও গরিব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আড়ালে বিদেশের দেওয়া অর্থ যে এতকাল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তিনি ব্যয় করতেন বিশ্ববাসী তা আজ জেনে গেছেন। আসলে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারি ও সেনা-পুলিশ ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ও মদতকারী। অনেকে রয়েছেন নেতৃত্বে। ইউনুস তাঁদের একজন। সত্যি বলতে, মুসলিমরা যতই শিক্ষিত হোন, অধিকাংশই শরিয়তপন্থী, সাম্প্রদায়িক, অনুদার, অপ্রগতিশীল, কূপমণ্ডুক, জেহাদি ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থক।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

তৃতীয় বিকল্প

ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে শাসক ও বিরোধী দল যেন এলাকা দখলের লড়াই-এ নেমেছে। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি, আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মার, পাল্টা মার, বদলা নেওয়ার পালা চলছে। নেতারা মুখে শান্তি চাই, শান্তির পক্ষে ভোট দিন বলে ভোটারদের অলীক স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। অথচ পুলিশের উপস্থিতিতে (জামুরিয়া) গাড়ী চাপা দিয়ে সংখ্যালঘু নেতাকে হত্যা করতে পেছপা হয়নি মারমুখী কয়লা মাফিয়া। তার আগে ব্যারাকপুরে ঘটেছে শাসক দলের কাউন্সিলার হত্যা, এসব দেখে মানুষ ভাবছে কোন্ পরিবর্তন আসবে ভোটের পরে! তার আগেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে পাহাড়ে। পাহাড়ে এবার ঘিসিং ও গুরং মুখোমুখি। সুতরাং 'ত্রাহি মাম্' ডাকছে রাজ্যবাসী। সুতরাং এক্ষেত্রে তৃতীয় বিকল্পই একমাত্র পথ।

—অভিজিৎ ভৌমিক, দার্জিলিং।

নোয়াখালি সম্মিলনী

গত ৬ মার্চ নোয়াখালি সম্মিলনীর মিলনোৎসবে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে উপস্থিত হলাম। যেহেতু, আমার অনেকটা দাঙ্গা-দেশভাগ—ক্ষমতা হস্তান্তর—স্বাধীনতা ইত্যাদি দেখা, তাই উৎসুক্য ছিল চরম। কিন্তু, মিলনোৎসবের অনুষ্ঠানসূচী যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল, তাতে নিরাশই হলাম।

নোয়াখালি সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে যে আঙ্গিকেই হোক না কেন—নোয়াখালির দাঙ্গা—দেশভাগ— খণ্ডিত স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে, তার যে আলাদা গুরুত্ব থাকা উচিত ছিল—তা দেখিনি। আমার সাথে সাথে উপস্থিত অনেকেই পরে ফোনালাপে জানতে পেরেছি—তারাও সমভাবে হতাশ। যারা, অন্ততঃ একটা বিস্মৃতির অতল গহ্বরের দিকে ছুটে চলেছে ইতিহাসের সোনালী পাতাকে আলোকিত করতে—তাদের প্রাপ্তির ঘর শূন্য।

একমাত্র ওই মিলনোৎসবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ যিনি প্রয়োজনীয় ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ দুটি বই প্রকাশ করে ইতিহাস অন্বেষুদের রসনাতৃপ্তি করলেন। স্মৃতিচারণা ও পরিচয়-পর্ব সূচক কোনও কর্মসূচী থাকা উচিত ছিল।

তাই, সম্মিলনীর বর্তমান কর্ণধারদের বলি, ভবিষ্যতে মিলনোৎসবে পরিচয়পর্ব ও স্মৃতিচারণামূলক অনুষ্ঠান রেখে ইতিহাস অন্বেষুদের সাহায্য করবেন। অধিকন্তু, একটা ভালো লাইব্রেরী তৈরি করে গবেষকদের গবেষণার পথকে সুগম করবেন—আশা করি।

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে বি এম এসের খোলা চিঠি

১। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে তিন কোটি গ্রামীণ এবং অসংগঠিত শ্রমিক আছে, এইসব শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরী কত হবে? এব্যাপারে আপনার দলের চিন্তাভাবনা কি? ২। এইসব অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার কি ব্যবস্থা আপনারা করবেন? ৩। এইসব অংসগঠিত শ্রমিকদের কাজের কোনও গ্যারান্টি বা নিরাপত্তা নেই। এদের কাজের নিরাপত্তার বিষয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি? ৪। এইসব শ্রমিক যে যে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, এইসব শিল্প বিনা কারণে মালিকপক্ষ বন্ধ করে দিচ্ছে, তাই ওই শিল্পের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার বিষয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি? ৫। নির্বাচনের আগে কোনও Central Trade Union-এর সঙ্গে আপনাদের, শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কাদের সঙ্গে হয়েছে? ৬। বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও চা শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে সর্বশেষ ১৯৭৯ সালে বেতন ক্রম স্থির হয়েছে, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে সর্বশেষ ১৯৮০ সালে হয়েছে। পাট ও চা শিল্পে নূতন করে বেতন চুক্তি হলেও সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী আইন মালিকরা মানছে না এবং চুক্তি ও ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানে আপনাদের মতামত ও পরিকল্পনা কি? ৭। বেসরকারী ক্ষেত্রে বেতন/মজুরী বোর্ড গঠনের আইন এখনও কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বলবৎ করেনি ফলে সারাদেশেই বেতন চুক্তি নিয়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা চলছে, এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আপনার দলের পরিকল্পনা কি?

উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর ও শ্রমিকদের স্বার্থে আপনার ও আপনার দলের পরিকল্পনা আমাদের জানান এবং সন্তোষজনক হলে শ্রমিকদের ভোট এবং সমর্থন পাবেন।

—বৈজনাথ রায়, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক—
ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ।

মন্দিরে মন্দিরে

জানকীবল্লভের ‘পঞ্চরত্ন’ এক অনন্য দেবালয়

ডঃ প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত তিলন্তপাড়া গ্রামটির গৌরব তার এক অপরূপ মন্দির। এই গ্রামের মাইতি পরিবারের এক পূর্বপুরুষ এই সুন্দর মন্দির

প্রতিষ্ঠা করে বাঙলার পুরাকীর্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এটি জানকীবল্লভের ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দির। স্থাপত্য ও অলংকরণ সাজসজ্জার নিরীখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এ এক অনন্য দেবালয়। শুধুমাত্র সুন্দর সুন্দর ‘টেরাকোটা’-ফলকই নয়, এই মন্দিরের দেওয়ালে চুনবালির ‘স্টাকো’ মূর্ত্তি এবং বাটা মিহি চুনে রঙ মিশিয়ে ‘পঙ্কে’র যে চিত্র আছে, তা ‘টেরাকোটা’ অলংকরণের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। একই সঙ্গে এই তিনটি পৃথক পৃথক অলংকরণ খুব

নানা রঙের নববর্ষ

বছরের প্রথম দিনটি সব দেশের সব মানুষের কাছেই আনন্দের এবং উৎসবের দিন। নতুন বছরের পয়লা দিনটিকে আমরা নববর্ষ বলি। কিন্তু কাল-প্রবাহের না আছে কোনও সূচনা, না কোন ছেদ বা অন্ত। অনন্তের পথে চলেছে কাল নিরন্তর গতিতে। সেই কাল-প্রবাহকেই মানুষ ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের সুবিধার জন্য—বর্ষ মাস দিন ও ক্ষণ। এই ভাগের হেতু নানা দেশে নানা রকমের। লিখেছেন নির্মল কর।

প্রাচীন ভারতে বিক্রমাব্দ (৫৮ খৃস্টপূর্ব থেকে শুরু) বা শকাব্দ (৭৮ খৃস্টপূর্ব থেকে শুরু) শুরু হোত চৈত্র মাসের পয়লা তারিখ থেকে। বেদে চৈত্রমাস মধুমাস রূপে চিহ্নিত। পরবর্তীকালে অগ্রহায়ণকে ‘মার্গশীর্ষ’ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ‘হায়ণ’ মানে নতুন ধান। ধান কাটার সময় থেকেই শুরু হোত বর্ষ গণনা।

বর্তমানে বর্ষগণনার দু’টি রীতি প্রচলিত। খৃস্টানরা বর্ষগণনা করেন সূর্যের গতিবিধি অনুযায়ী। ভারত, মিশর, আরব, প্রাচীন চীন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষ বছর গণনা করেন চাঁদের তিথি বা হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে। আজও বাংলা সাল নির্ণয়কালে আমরা চাঁদের দুইপক্ষ বা তিরিশটি তিথি গণনা করে থাকি। যে পক্ষ পূর্ণিমা দিয়ে শুরু তা শুক্লপক্ষ আর যেটা শুরু হয় অমাবস্যা দিয়ে তার নাম কৃষ্ণপক্ষ। উত্তর ভারতে মানুষ মাস গণনা শুরু করেন শুক্লপক্ষের প্রথম দিন থেকে। কিন্তু ভারতের মানুষেরা কৃষ্ণপক্ষ থেকে। ইহুদিরা চন্দ্রমাস অনুযায়ী বছর হিসেব করেন। ওই হিসেব অনুযায়ী নতুন বছর আসে শরৎকালে। নতুন বছরের নাম ‘তিসিরি’।

বাঙালির যেমন পয়লা বৈশাখের পুণ্যাহ, অসমীয়ারাও নববর্ষে পালন করেন ‘বেহাগবিহু’ বা বসন্তোৎসব, গুজরাটিদের নববর্ষ দেওয়ালির দিন। দক্ষিণ ভারতের একাংশে এপ্রিলের ‘পোঙ্গল’ পার্বণই নববর্ষ উৎসব। অন্ধ্রে নতুন বছরের শুরু ৪ এপ্রিল, তামিলনাড়ুতে ১৪ এপ্রিল, শ্রীলঙ্কাতেও নববর্ষ সূচক ১৪ এপ্রিল।

পারস্যবাসীরা ২৮ আগস্ট পালন করেন ‘শাহানশাহী’—ইরানের প্রথম শাহের জন্মদিন থেকে বর্ষ গণনার শুরু। এছাড়া পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানেরা বছর হিসেব করেন ‘হেজিরা’ সন অনুযায়ী। মহম্মদ যখন ৬২২ খৃস্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় আসেন, তখন থেকে হেজিরার শুরু। হেজিরা সন অনুসারে বছর গণনা হয় মার্চের শেষ বা এপ্রিলের গোড়ায়। ইরানের নববর্ষ উৎসবকে বলে ‘নওরোজ’। পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে নববর্ষ উৎসব পালিত হয় মার্চের ২২ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে।

থাইল্যাণ্ড, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে নতুন বছর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে। ব্রহ্মদেশে এপ্রিলের শুরুতে একটি ‘জল-উৎসব’ পালনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় নববর্ষের জয়যাত্রা। তখন সারাদেশে চলে নৌ-বাইচের বর্ণাঢ্য সমারোহ। ইথিওপিয়ার নববর্ষ আশ্বিন মাসে। শরৎ তাঁদের বছরের প্রথম ঋতু। বড়দিনের আনন্দোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই ৯ জানুয়ারি নববর্ষের বার্তা বয়ে আনে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের সংস্কৃতিতে। প্রায় ১১০টি দেশের ক্যালেন্ডারে পয়লা জানুয়ারি তারিখটি ছাপা হয় লাল কালিতে। ১ জানুয়ারি থেকে বর্ষগণনার সূচনা জুলিয়াস সিজারের আমল থেকে। তাই পাশ্চাত্য ক্যালেন্ডারের আর এক নাম জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। সিজারের আগে বছর শুরু হোত সেপ্টেম্বর থেকে। ৪৫ খৃস্টপূর্ব থেকে সিজার ১ জানুয়ারিকে নববর্ষের পহেলা তারিখ রূপে ঘোষণা করেন। বর্তমানে যে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ঘরে ঘরে ঝুলতে দেখা যায় সেটা জুলিয়ান নয়, গ্রে-গেরিয়ান। পোপ ১৩শ গ্রেগরি ১৫৮২ খৃস্টাব্দে প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ভুলত্রুটি সংশোধন করে এই নতুন বর্ষ-গণনা রীতি চালু করেছিলেন।

কম মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়।

'টেরাকোটা'-ফলকগুলির মধ্যে পৌরাণিক দেবলীলার মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কয়েকটি দৃশ্যফলক যেন জীবন্ত রূপ, যা আর কোনও মন্দিরে এতটা দেখা যায় না। মন্দিরশিল্প ও পুরাকীর্তি প্রেমিককে তাই এই মন্দির দর্শন করার আহ্বান জানাই।

দক্ষিণমুখী ইঁটের এই মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যথাক্রমে ২০ ফুট ৪ ইঞ্চি ও ২০ ফুট (৬.২ ও ৬.১ মি.)। উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (১০.৬ মি.)। সামনের দিকে কার্নিশের নিচে পোড়ামাটির দুটি ফলকে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক লিপি আছে। দুটি লিপিই যথাযথ সারি ও বানান অনুসারে এখানে উদ্ধৃত করা
হলো ঃ

১.	শ্রীশ্রীজান	২. ১৭৩২
	কি বল্লব	সন ১২
	যুভমস্তু	১৮ সাল
	সকাব্দা	

উদ্ধৃত লিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, জানকীবল্লভের এই মন্দির ১৭৩২ শকাব্দ ও ১২১৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ১৮১০-১১ খৃস্টাব্দ মন্দিরটির নির্মাণকাল। অবশ্য লিপিটি থেকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণ শিল্পীর নাম জানা যায় না। অন্যান্য মন্দিরের মতো লিপিতে সে সময়কার বানান বা উচ্চারণ অনুসারী বানান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই লিপিদুটির ওপরে সংস্কারকালীন একটি লিপিও আছে। সেটিও এখানে দেওয়া হলো ঃ

পুন সমস্কার

সন ১৩২০ শকাব্দ অথবা ১৩২০ বঙ্গাব্দ। ১৮৩৫ শকাব্দে বা ১৯১৩ খৃস্টাব্দে মন্দির সংস্কার করা হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকালের ১০২ বছর পরে এই সংস্কার হয়। সম্ভবত স্টাকোর মূর্তিগুলি সেইসময় বসানো হয়। প্রতিষ্ঠাকালে টেরাকোটা মূর্তি ও পঙ্কচুনের প্রলেপে চিত্র ছিল মনে করা যায়।

মন্দিরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মতো। নিচের চারচালার ছাদের ওপরে চারকোণে চারটি রত্ন বা চূড়ো এবং কেন্দ্রস্থলে যে বড় 'রত্ন' বা চূড়ো আছে, সেগুলি 'রথ'-বিন্যাসযুক্ত দেউলের মতো দেখতে হলেও আসলে তা বাঙালির অতি প্রিয় 'চালা'রই এক রূপ। সব চূড়োগুলিরই ধনুকের মতো বাঁকানো কার্নিশ বা ছাঁচা লক্ষ্য করার মতো। এই মন্দিরটির সাথে বা এর 'চালা' রত্নগুলোর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে পাঁশকুড়া থানার (পূর্ব মেদিনীপুর) গোঁসাইবেড়ের রাধাবল্লভের মন্দিরের। অবশ্য, সেই মন্দিরটি আরও পুরানো বলে অনুমান। জানকীবল্লভের এই মন্দিরটির নিচের বৃহৎ চালাটির বাঁকানো কার্নিশের মধ্যে খড়ের চালের ছাঁচার ভাবটি সুপরিস্ফুট। এর নিচে দুই সারির অনেক খোপে দেবদেবী ও মনুষ্যের বহু টেরাকোটা ফলক বসানো আছে। পূর্বদিকের 'ফ্যাসাডে'র ওই দু' সারির খোপগুলোর ঠিক নিচে আর দু'টো বাঁকানো কার্নিশ যেন আর একটা আলাদা চালা, তার নিচে আবার ছোট ছোট্ট কুলুঙ্গি বা খোপে টেরাকোটা মূর্তিফলক স্থাপিত। এদিকে তিনটি 'খিলান' থাকলেও মাঝখানেরটি শুধুমাত্র প্রবেশ বা বের হবার পথ। পাশের দুটি খিলানের নিচে আছে বদ্ধ ভিনিসীয় দরজা যা শুধুমাত্র স্থাপত্য অলংকার বা অলংকরণের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। এর ওপরের তিনটি প্রস্থে টেরাকোটা মূর্তিসমারোহ এবং চণ্ডীর উপাখ্যানের দৃশ্যগুলি জ্বলন্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মন্দিরটির সামনের দিকে (দক্ষিণদিক) 'ত্রিখিলান' প্রবেশ পথ আছে। এরপর ঢাকা বারান্দা। গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ চারটি ছোটবড় খিলানের ওপর গোলাকার ভল্‌টে গঠিত।

এই মন্দিরের দেওয়ালের তিনদিকে প্রচুর 'টেরাকোটা' মূর্তি সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু উত্তর দিকের দেওয়ালে বেশ কিছু চুন-বালির মূর্তি (স্টাকো) লক্ষ্য করা যায়। টেরাকোটার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এই মন্দিরে এত বেশি আছে, যা খুব কম মন্দিরে দেখা যায়। গতানুগতিক রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ছাড়াও সে সময়ের সামাজিক চিত্রের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হয়। একটি মর্মান্তিক দৃশ্য হলো, সমুদ্রজাহাজের ওপর থেকে দু'ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সমুদ্রবক্ষে জলজন্তুর মুখে নিঃক্ষেপ, আর্তব্যক্তিদ্বয়ের চিৎকার, সে যুগের হার্মাদ জলদস্যুদের বীভৎস অত্যাচারের পরিচয় দেয়। অপর একটি ফলকে আছে, সাহেব-মেমের যৌনসম্ভোগদৃশ্য—চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেব ও নিচে কুকুর। অপর দু'একটি দৃশ্য, এক অভিজাত ব্যক্তির পদব্রজে গমন— তাঁর মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে একজন ভৃত্য। একটি চিত্তাকর্ষক শিকারদৃশ্য— ঘোড়ার পিঠে বন্দুকধারী এক সাহেবের হরিণ শিকার এবং উটের পিঠে বাজনা বাজিয়ে বনে হরিণ 'খেদা' দৃশ্য প্রভৃতি।

পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আছে মা দেবকীর শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে প্রসববেদনা, কংসকর্তৃক মহামায়াকে হত্যাচেষ্টা ও উগ্রসেনের নিষেধবাণী, বসুদেবের যমুনাতরণ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তৃণবর্ত্মাসুর, ঘোটকাসুর প্রভৃতি অসুর বধ। (দ্রষ্টব্য, প্রণব রায়, 'মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ', প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৮)।

মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়ালে পূর্বোক্ত মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর কাহিনী দৃশ্যফলকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভবধদৃশ্য। [বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য মন্দির-'টেরাকোটা'য় চণ্ডী উপাখ্যান' (আলোকচিত্রসহ), 'ভূমিলক্ষ্মী', ১৯, আশ্বিন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ—'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশন]।

মন্দিরটির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে লৌকিক চণ্ডীর জনপ্রিয় কমলেকামিনী দৃশ্য বড়ই আকর্ষণীয়। (বর্তমানে লেখকের 'মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে এই মন্দিরের বিবরণী দেওয়া আছে, পৃ. ১৪৮-৪৯)। কমলেকামিনী দৃশ্যফলক মেদিনীপুর জেলার অনেক' টেরাকোটা' মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি।

উত্তরদিকের দেওয়ালে 'স্টাকো' মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি 'মিথুন দৃশ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন, শৃঙ্গারের পূর্বে যুবক-যুবতীর 'রতিবিলাস', সাহেব-মেম প্রভৃতি দৃশ্যের সঙ্গে আবার পৌরাণিক কয়েকটি দৃশ্যও এসে গেছে, যেমন, সমুদ্রমন্থন।

'শঙ্খ'-অলংকরণ (কেউ কেউ 'পঙ্খ'ও বলে থাকেন) সেকালে মন্দির সাজসজ্জায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মিহিবাটা চুনের প্রলেপের ওপর নানা রঙে ফুল লতাপাতার নকশার কাজ মন্দিরগর্ভগৃহের দেওয়ালে করা হোত। এই মন্দিরের গর্ভগৃহপ্রবেশ পথের মুখে ওপরের দেওয়ালে আমরা পঙ্কের কাজ লক্ষ্য করেছি।

জানকীবল্লভের মন্দিরে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর একটি 'টেরাকোটা'-ফলক আমরা এই মন্দিরের পুবদিকের দেওয়ালে লক্ষ্য করেছি। চণ্ডীকাহিনীর সঙ্গে এই মূর্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দৃশ্যের মধ্যে দেবী আবির্ভূতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি দেবী মূর্তিও এখানে উপস্থিত হয়েছে। সকলেই অসুরগণের সাথে যুদ্ধরত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একটি সুদৃশ্য ও অলংকৃত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও শিল্পী, স্থপতির নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। সেকালে যাঁরা এমন কারিগরি কৌশল ও শিল্পকর্মে দক্ষ ছিলেন, তাঁদের অনেকের নাম আজ হারিয়ে গেলেও কোনও কোনও মন্দিরের লিপিতে তাঁদের নাম আজও অক্ষয় হয়ে আছে। মন্দিরস্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা দুজনেই এই ধরনের শিল্পগৌরবকে তুলে ধরার জন্যে অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। এই কীর্তিগুলি বাঙলার প্রাচীন সম্পদ। এগুলি রক্ষা করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়ণের ফলে এইসব শিল্পগৌরব আজ অবলুপ্তির পথে। তিলন্তপাড়ার জানকীবল্লভের এই মন্দির পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একটি অনন্য শিল্পকীর্তি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নারী জাগরণের পুরোধা জ্ঞানদানন্দিনী

ইন্দিরা রায়

নারীবর্ষে নারীদের নানা সভা-সমিতির আলোচনা সভায় হয়ে গেল পরাধীন ভারতবর্ষে, সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারে নারীর প্রতি বঞ্চনা, নির্যাতন, অশিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে নানা কথাবার্তা। সে যুগের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দিতে এমনই একজন নারী, যিনি পুরুষশাসিত বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা, নারী জাগরণ এবং পর্দাপ্রথার বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বধূ—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচয় হয়তো অনেকের কাছেই অজানা। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। আরও সহজ পরিচয় তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ বৌদি। জ্ঞানদানন্দিনীর বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে খুবই সাদাসিধে পরিবারে জন্ম তাঁর। শ্বশুরবাড়ি ছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা উদারপন্থী বনেদি পরিবার। খুবই অল্প বয়সে মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় সতেরো বছরের সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

কলকাতার বুকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে এসে জ্ঞানদানন্দিনী হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল পরিবারের সর্বময় কর্তা তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরমশাই। বিশাল পরিবারের উদারচেতা মানসিকতার পরিচয় তিনি পান এ বাড়িতে নববধূ ও অবিবাহিত কন্যাদের শিক্ষাদানের আয়োজনে। বিবাহের তিন বছর বাদে তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ইংলন্ডে পাড়ি দেন। সে সময়ে শ্বশুরালয়ের এই নারীশিক্ষার মুক্ত পরিবেশে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর স্বামীর প্রগতিপন্থী সাহচর্য পেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চাইতেন উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে দেশের মেয়েরা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে পুরুষের মতোই উন্নতি এবং সৃজনসাফল্য লাভ করুক। কিন্তু নারীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মুক্ত স্বাধীন চিন্তা পরিবারের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর ক্ষেত্রে শিক্ষিত হবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল এ হেন স্ত্রী-প্রেমী স্বামীর সাহচর্যে। তিনি শুধু শিক্ষিতই হননি, উন্নত আধুনিক শিক্ষায় নিজের মন বুদ্ধি সঁপে দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীক্ষেত্রে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে সমস্ত দিক থেকে অত্যন্ত সহজেই এবং স্বল্প সময়েই নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেয়েদের আধুনিকমনা এবং সংস্কারমুক্তমনা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শুধুমাত্র বিদেশে থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ওই দেশের নারীদের মুক্ত, স্বাধীন শিক্ষিতাদের ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাবুদ্ধি ও চারিত্রিক গুণাবলীর কথা চিঠিতে জানা যায়। পাশ্চাত্যের মহিলাদের দ্বারা জ্ঞানদানন্দিনীকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা সত্যেন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করলে বোঝা যাবে।

'তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরপ্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইংলন্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। তোমাকে আলিঙ্গন দিবার জন্য কত কত স্ত্রীলোক এখানে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছে।'

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ভারত সরকার তাঁকে উচ্চ-প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করে তৎকালীন বোম্বাইতে পাঠান। একান্নবর্তী পরিবারের রক্ষণশীলতা ভঙ্গ করে তিনি বাড়ি থেকে সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে যান কর্মস্থলে। নিজের পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে গিয়ে যোগ্য সহধর্মিণীর মতো উপযুক্ত হয়ে ওঠেন সেকালের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানদা। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি নারীসমাজে প্রথম পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদে। তৎকালীন সমাজে চার দেওয়ালের বাইরে মহিলারা বার হতেন শুধুমাত্র পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে। পোশাক ছিল মামুলি। সেক্ষেত্রে সাজপোশাকে আধুনিকতার ছোঁয়া এবং শৈলীর পরিবর্তন আনলেন। শাড়ি পরার যে আধুনিকধরন, তা উনিই প্রথম চালু করেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ইংরেজ আমলে স্বামীর সঙ্গে বড়লাটের আমন্ত্রণে আধুনিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই ঘটনা দেশের মধ্যে এক আলোড়ন তৈরি করেছিল। এই আলোড়নকে 'নারী জাগরণ'-এর আন্দোলনের প্রাথমিক শুরু হিসেবে ভাবা গিয়েছিল।

তিনিই ওই পরিবারের প্রথম মহিলা যিনি বিদেশে পাড়ি দেন এবং পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে বসবাসও করেন। এটিও তাঁর নারী স্বাধীনতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। দুই সন্তানের জননী হয়েও ইংলন্ডে থাকাকালীন তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। শুধু নিজে নয়, পুত্র কন্যাদের উন্নত শিক্ষা ও সুরুচি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের শুধু উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থাই করেননি, তিনি নিজে তাদের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য, যেমন--- শেলী, কীটস, টেনিসন, শেক্সপীয়রের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। পরবর্তীকালে জ্ঞানদানন্দিনী শুধু বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে জ্ঞানার্জন নয়; রীতিমত দক্ষতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি থেকে তাঁরই সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল যে, ঠাকুর-পরিবারের বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা তাদের রচনা দিয়ে যাতে তারা পত্রিকাকে ভরিয়ে দেয়। এই পত্রিকা সম্পাদনার কাছে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছিল। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনায় নানাভাবে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যেতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্না সাহিত্যজ্ঞানী জ্ঞানদানন্দিনী। তিনি শুধু সাহিত্য, শিক্ষায় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ ও দক্ষতা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নাটক-সঙ্গীত অভিনয় এর চল ছিল।। সেক্ষেত্রেও জ্ঞানদানন্দিনীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি নেত্রীর ভূমিকাও গ্রহণ করতেন। এসব ব্যাপারে তাঁর এতটাই উৎসাহ ছিল যে, বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে অভিনয় করতেন। শুধু বাড়িতে নয়, বাড়ির বাইরে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে সুমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করেন। জায়গাটা ছিল সম্ভবত সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের কাছাকাছি কোনও বাড়িতে। সাংসারিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

আমার ঠাকুর্দা প্রেমোৎপল বিশ্বাস

বনান্তিকা বিশ্বাস

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

বছর তিনেক আগের কথা।

দাদু হঠাৎ সেদিন আমার পড়ার ঘরে ঢুকে বললেন—

—'লেখ্।'

—"কি লিখবো?"

—লেখ্,

"জীবন শুকিয়ে গেছে, আছে তবু সুর
বিশুষ্ক বকুলে তাই দিন ভরপুর।"

একটা চিরকুটে এই চারটে লাইন লিখে দাদুকে দিলাম।

দাদু সেটা নিয়ে কি করলেন, কোথায় গেলেন জানি না। জিগ্যেসও করিনি।

আজ দাদু অন্তহীন অনন্তের পথের যাত্রী। আজ শুকিয়ে গেছে জীবন। তবু সুর আছে। আছে, রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে বসে আত্ম-আবিষ্কারের নেশা। আছে, দাদুর লেখার শূন্য চেয়ারখানি। আছে তাঁর দেওয়া লেখনীশক্তি।

কিন্তু আজ আমি কি লিখবো? কি বলবো? বাক্য তো উৎসারিত হচ্ছে না! হৃদয়-কন্দর হতে কথাকলি তো বেরিয়ে আসছে না! বিচারে খুঁজে পাচ্ছি কই বাক্যের জ্যোতির্ময় সেই উপকূল?

—এর উত্তরও তো দাদুই আমায় দিয়ে গেছেন। দাদু বলতেন—"Our speech is great, Our silence is greater." বলতেন—কুয়োর জলে ঢিল ফেলো, শব্দ হবে। সমুদ্রে ফেলো,—নীরব, নিথর, নিশ্চুপ। যে জলাশয়ে জলরাশি যত গভীর, ঢিলের প্রক্ষেপণে সেখানে শব্দ তত কম। তেমনি, বেদনা যেখানে গভীর, বাক্য সেখানে নিস্পন্দ। বাক্য যেখানে বাঙ্ময়, বেদনার সেখানে ঠাঁই নেই।

তবু দাদু,

"তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি নির্জনে, মোর নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।"

কেবলই মনে হচ্ছে, অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-কারাগারে চিরকালের মতো যিনি আমায় বন্দী করে ফেলেছেন, তাঁর কথা রচি কেমন করে? দাদুর স্নেহের শিখা, তাঁর তপস্যার, সাধনার জয়দৃপ্ত স্বর্ণটিপের ললাটলিখা আমার কপালে তো জ্বলজ্বল করে জ্বলছেই। তাই তাঁকে হারানো সত্ত্বেও জীবন আমার পূর্ণ করেছে তাঁরই বিফল বাসনারাশি।

পিসিমণির মৃত্যুর পর দাদুকে প্রায়ই আবৃত্তি করতে শুনতাম রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি। দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এমন কেন হয়?

দাদু খানিক চুপ করে ছিলেন। তারপর একটু হেসেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, সময় নদীর বুকে মানুষের জীবন এক সোনার তরীর মতো। জীবনের নানান ঘাটে ঘাটে সেই সোনার তরণীখানি তার হৃদয়ভরা সোনার ধান নামিয়ে নামিয়ে দিয়ে, এগিয়ে এগিয়ে যায়। বেদনাবিধুর অন্তর তখন খুবই আহত হয়; তবু 'যেতে দিতে হয়'।

আজ স্মৃতির নৈঃশব্দের তীরে বসে আমার দাদুকে আরতির এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাকে দুর্বল না করে শক্তি দাও। জানি কাল,

"জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায়"।

তবু দাদু যেখানেই থাকো, জেনো; মনকোরকের মধ্যে স্বপ্নস্বর্গ সন্ধান করে আজ পূজার যে নৈবেদ্য ডালিখানি সাজিয়েছি, যে কলস্বনা বাঁশরীকে আমার কথার আমি সংগ্রহ করেছি, তোমার পথ ধরেই সাধনা-সঙ্গীতের মধ্যখানে যে গীতি পথপ্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে এইখানে আজ এসে পৌঁছেছি, সেখানে পথে প্রান্তরে আমার কোনও কাজে কর্মে জ্ঞানত আমি তো কোনও হেলাফেলা করি নাই। তাই তোমার পরশমণির ছোঁয়া আজও আছে আমার কথায়, আমার লেখনীতে। আজ,

"আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।"

—এই আমার রইলো প্রণাম।।

[লেখিকা প্রয়াত প্রেমোৎপল (ছদ্মনাম বিশাখা) বিশ্বাসের নাতনি]

দিলীপ কুমার আঢ্য

সাধারণ কার্যকতা অসাধারণ কাজ

দিলীপ কুমার ঘোষ

ভারতবর্ষের কোণে কোণে ডাঃ হেডগেওয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যে লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন স্বর্গত দিলীপ আঢ্য তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। সাধারণভাবে এইটুকু বললে তাঁর স্বয়ংসেবক জীবনের পরিচয় হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন এই সাধারণ এবং শান্ত মেজাজের মানুষটির মধ্যে কেমন নিষ্ঠা, সাধনা, ধৈর্য, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, পরোপকারী ভাব ছিল। যে কোনও লোককে আপন করে নেওয়া এবং তার সুখ দুঃখে সহভাগী হওয়া তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। জীবনে দায়িত্ব পালন কি করে করতে হয় তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন।

সাধারণ পরিবারের সন্তান—চার ভাই, চার বোন। ফলে প্রথম থেকেই সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার অভ্যাস। বাল্যাবস্থায় স্বয়ংসেবক হন এবং আজীবন সেই পরিবেশের মধ্যে কাটিয়েছেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। চার ভাই স্বয়ংসেবক, তিন ভাই সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত। কখনও কোনও দায়িত্ব অস্বীকার করেননি।

প্রথম বড় পরীক্ষার সামনে পড়তে হয় যুবাবস্থাতেই, যখন তাঁর বড় ভাই বর্তমান সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক বিজয় আঢ্য যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক সামলাচ্ছেন। তিনি পড়াশোনা শেষ করে বললেন, আমি ঠিক করেছি সঙ্ঘের প্রচারক হব; কিন্তু বাড়ির দায়িত্ব কে সামলাবে? দিলীপদা এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বললেন, তুমি যাও, আমি সব দেখে নেব। সেই দেখা থেকে কখনও তিনি নিষ্কৃতি পাননি। ভাইবোনদের লেখাপড়া, বিয়ে নিয়ে চিন্তা করা, বাড়িতে বাবা-মা ও ঠাকুমার মধ্যে প্রায়ই কেউ না কেউ অসুস্থ থাকতেন, তার চিন্তা, স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারের চিন্তা এবং পড়শিদেরও চিন্তা করতে হোত। এতসব চিন্তার মধ্যে নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করার সময় পাননি, তাই বিয়ের বয়স পার করে বিয়ে করতে হয়েছে, ফলে একমাত্র কন্যা এখনও কলেজে পড়ছে। কথা প্রসঙ্গে আরও জেনেছি, দু'ভাইয়ের মধ্যে কখনও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি; মনান্তর তো দূরের কথা। বোধহয়, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে ভাই ও বন্ধু সমার্থক হয়ে উঠেছিল।

তাঁর স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল ছিল না। প্রায়ই পেট ভোগাত। সেই অবস্থায় সঙ্ঘের কাজে সুন্দরবন এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। সরকারি অফিসের বড় দায়িত্ব পালন করে সঙ্ঘের কাজে সময় দিয়েছেন। স্বয়ংসেবকদের সামনে অবিভাবক হিসাবে সবসময় দাঁড়িয়েছেন। প্রান্তের সেবা বিভাগ কয়েক বছর ধরে সামলাচ্ছিলেন। প্রকল্প চালানো, কার্যকর্তা বর্গ, ধনসংগ্রহ বা স্মারিকা প্রকাশ সব নিয়ে ভাবতেন। সারাজীবন সঙ্ঘের জন্য সময় দিয়েছেন, বর্তমান চাকরি থেকে সেবা নিবৃত্ত হয়ে বেশীরভাগ সময় সেবা কাজের জন্য প্রচার করতেন, সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে পুরো সময় দায়িত্ব নিয়ে থেকেছেন। তিনি কোনও দারুণ বক্তা ছিলেন না, কিন্তু সবার মধ্যে থেকে সবাইকে নিয়ে কি করে কাজ করতে হয় তা ব্যবহারে দেখিয়েছেন। অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, শুরু করে শেষ করে যেতে পারেননি, তার মধ্যে নিজের বাড়ির কাজও। পরিবার বাড়ার জন্য ঘরের সঙ্কুলান হচ্ছিল না তাই নতুন বাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ হয়নি। পরিবারের কাজ তো বাকি আছেই তার সঙ্গে সংগঠনের কাজও তিনি সারাজীবন যাদের জন্য চিন্তা করেছেন যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের জন্য হয়তো এই কাজ রেখে গেলেন।

দুর্নীতির সর্দার ও সর্দারণী
পরিবর্তনের ঢেউ কি দিল্লীতে পৌঁছাবে?

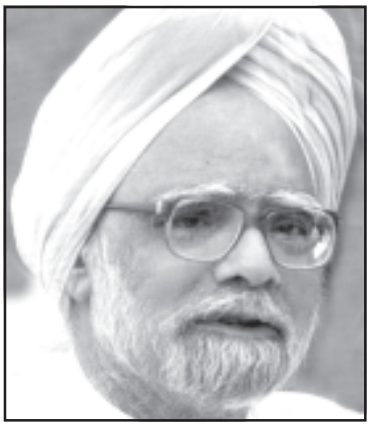

মনমোহন সিং সততার মুখোস পরে থাকেন; কিন্তু অসৎ সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাদের কুকীর্তি কুকর্ম সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন না। লোকসভায় দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের নির্দোষিতার পক্ষে গলাবাজি করেন।

শিবাজী গুপ্ত

পথেঘাটে কিছু বয়স্ক লোককেও বাচ্চালোকের মতো বিজ্ঞোচিত রাজনৈতিক মন্তব্য করতে শোনা যায়—''কংগ্রেসের মধ্যে অনেক চোর ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকলেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একজন সৎ লোক।'' কিন্তু যে দলপতি দলের সদস্যদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না, জেনেও মুখ খোলেন না—তাকে সৎ লোক বলা যায় কোন নীতিশাস্ত্রের বিচারে? নীতিশাস্ত্রেই বলেছে—'সংসর্গজা দোষাগুণাঃ ভবন্তি' বা ''A man is known by the company he keeps'' অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির সাঙ্গোপাঙ্গদের কীর্তিকলাপ থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নীতিবাক্যানুসারে মন্ত্রিসভার সদস্যদের গুণের যেমন তিনি ভাগীদার, দোষেরও তিনি অংশীদার। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সকল অপরাধ অপকর্ম ও দুর্নীতির দায়ভার দলপতি হিসাবে মনমোহন সিং-এর উপরই বর্তায়। তাঁর মন্ত্রিসভা যদি চোরের মন্ত্রিসভা হয়, তাহলে তিনিও চোরের সর্দার বলে চিহ্নিত হবেন। তিনি—জানি না, শুনি নাই, আমাকে বলে নাই বলে হাত ধুয়ে সাধু সাজতে পারেন না। তিনি চুরির ভাগ না নিতে পারেন; কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকলে ও সাফাই গাইলে আইন আদালতে না হোক, জনতার আদালতে তিনি ছাড় পাবেন কোন্ যুক্তিতে?

মনমোহন সিং সততার মুখোস পরে থাকেন; কিন্তু অসৎ সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাদের কুকীর্তি কুকর্ম সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন না। লোকসভায় দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের নির্দোষিতার পক্ষে গলাবাজি করেন। তারপর যখন বিরোধী পক্ষের আক্রমণে হালে পানি পান না, তখন তাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত করে স্তাবকদের হাততালি কুড়ান। তিনি কথার মারপ্যাঁচে, এম. পি. কেনাবেচায় যতই দক্ষতা দেখান বা, আদবানীজী বা সুষমা স্বরাজকে অপ্রস্তুত করতে পারেন; কিন্তু দুর্নীতি পঙ্কে যে তার মন্ত্রিসভা আপাদমস্তক নিমজ্জিত, সে কলঙ্ক কালিমা ধোয়ার মতো প্রয়োজনীয় জল যমুনা নদীতেও নেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমন কলঙ্কিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীসভা দিল্লীর গদীতে যে বসেনি একথা সর্ববাদীসম্মত।

খাস কংগ্রেসী ছাড়াও যে সব শাখা দল বা উপদল এই মন্ত্রিসভাকে বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে সমর্থন করছে, দুর্নীতি প্রশ্নে লোকসভার ভেতরে মৌন থেকে বাহিরে এসে মুখর হয়ে সতীত্ব জাহির করছে, মন্ত্রীত্বের ডুডু-টামাকু আকণ্ঠ সেবন করছে—তাদের গায়ে যে দুর্নীতি-পঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও কাদা লাগবে না তেমন পাকা পাঁকাল মাছ তাঁরা হননি। কাদা না লাগুক, কাদার গন্ধ থেকে গা বাঁচানো যাবে না কিছুতেই।

সুতরাং সর্দার মনমোহন সিং যদি চুরি না করেও চোরের সর্দার বলে সাব্যস্ত হন, তার মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরাও চোরেদের সাহচর্য দোষে চোরের সর্দার (মহিলাদের ক্ষেত্রে 'সর্দারণী') নামে অভিহিত হবেন, তা তাঁরা যতই তাঁতের শাড়ী পরুন বা চপ্পল পায়ে চটাচট করে চলুন না কেন।

এন ডি এ আমলে কফিন কেলেঙ্কারির ছুতা ধরে যিনি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করে সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন—ইউ পি এ আমলে পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র প্রমাণ কেলেঙ্কারি দেখেও তিনি গদি আঁকড়ে থাকেন কি মধুর লোভে? ছবি বিক্রি করে নির্বাচনী খরচ তুলবেন? মামদোবাজি আর কাকে বলে! এ রকম ভড়ংবাজি গান্ধী মহারাজ অনেক দেখিয়েছেন। এখন সেসব কেলেঙ্কারি তো একে একে প্রকাশিত হচ্ছে। ভালো কথা, যারা মন্ত্রীর আঁকা ছবি কিনবে চড়া দামে, তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয়টা জনসমক্ষে প্রকাশিত হলে জনগণের সন্দেহভঞ্জন হতে পারে।

পরিবর্তনটা কলকাতা থেকে আসানসোলে গিয়ে থমকে না থাকে যেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের ঢেউ যদি নয়া দিল্লীতে দুর্নীতির উৎসমুখে আঘাত হানতে না পারে, সে ধরনের আঞ্চলিক পরিবর্তনের লম্পঝম্পে জনগণের তেমন উৎসাহ নেই।

একলব্য ক্রীড়া প্রকল্প বিকাশ ও উপলব্ধি

শক্তিপদ ঠাকুর

১৯৮৭ সালে মুম্বইস্থিত কান্দিবলীতে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে একলব্য ক্রীড়া প্রকল্পের তথা দেশের বনবাসী (জনজাতি) খেলোয়াড়দের নিয়ে জাতীয় স্তরে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই মতো ১৯৮৮ সালের ১২ জানুয়ারি মুম্বইতে জাতীয় স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই সময় কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় ক্রীড়াপ্রমুখ ছিলেন অশোকজী সাঠে। সারাদেশের ১৫টি প্রদেশের বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী ৩৬৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। 'উড়ন্ত শিখ' অলিম্পিয়ান সর্দার মিলখা সিংহও উপস্থিত ছিলেন পূর্ণ সময়।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে মধপ্রদেশের ইন্দোর দ্বিতীয় ক্রীড়া মহোৎসবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি- সম্পন্ন তীরন্দাজ লিম্বারামজী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'তৃষ্ণা' পালনৌকা খ্যাত রাজস্থানের জয়পুরের অবসরপ্রাপ্ত মেজর এস এন মাথুর।

১৯৯৫ সালে রাজস্থানের উদয়পুরে মেজর মাথুর সাহেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শুরু হলো তৃতীয় রাষ্ট্রীয় বনবাসী ক্রীড়ামহোৎসব।

ক্রীড়ামোহৎসবকে আরও মজবুত করার জন্য স্থির করা হয় প্রতি বছর কোনও না কোনও একটা বিষয় নিয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা। শুরু হলো বনবাসী খেলায় নতুন সংযোজন—বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০০২ তে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় ভারতীয় খেল প্রাধিকরণ পরিসরে তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা, ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদে ভারতীয় খেল প্রাধিকরণ পরিসরে তীরন্দাজী ও ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা, ২০০৫ সালে উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্র জেলার বনবাসীবহুল গ্রাম বভনীতে তীরন্দাজী ও কবাডি প্রতিযোগিতা, ২০০৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া শহরে তীরন্দাজী ও ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়।

কল্যাণ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ এবং আরও কিছু বড় বড় কার্য্যক্রম থাকায় ২০০৪ সালে ক্রীড়া মহোৎসব করা সম্ভব হয়নি। ২০০৭ সালে বিদর্ভের অমরাবতী স্থিত হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল পরিসরে পঞ্চম রাষ্ট্রীয় বনবাসী ক্রীড়া মহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই মহোৎসবে ৩২ প্রদেশের ১৫২৭ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

২০০৯ সালে হিমাচল প্রদেশের সোলন-এ

তীরন্দাজী ও খো-খো, ২০১০-এ অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়বাড়ার নিকটস্থ কেতনকোণ্ডায় বার্ষিক তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়।

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ২০১১ সালকে 'ক্রীড়াবর্ষ' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা দেশের বনবাসী ক্ষেত্রে এই বছর আমরা একবিশিষ্ট প্রকারের পরিবেশ তৈরী করতে আগ্রহী। বনবাসী বালক-বালিকা অধিকাধিক সংখ্যায় যাতে খেলার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার জন্য দেশের সমস্ত বনবাসী এলাকায় অধিকাধিক সম্পর্ক করা হবে। নতুন-নতুন জনজাতির বালক-বালিকাদের প্রতিযোগিতায় সংযুক্ত করা হবে। অধিকাধিক স্থানে ক্রীড়াকেন্দ্র প্রারম্ভ করে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে খেলার পরিবেশ তৈরি করার জন্য খেলার উপকরণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

এবছর আমাদের ৬ষ্ঠ রাষ্ট্রীয় বনবাসী ক্রীড়ামহোৎসব সম্পন্ন করার কথা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের পুণা নগরীতে এই উৎসবের আয়োজন করা নিশ্চিত হয়েছে।

সারাদেশে বনবাসী বালক-বালিকা দীর্ঘদিনের কুণ্ঠা ত্যাগ করে খেলা শুরু করেছে। তাদের স্বাভাবিক শারীরিক শক্তি ও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা যাতে যোগ্য মঞ্চ পায় তার জন্য তাদের মনে প্রবল আগ্রহ। সম্ভবত, এই কারণেই জনজাতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয় বছরে একবার বনবাসীদের মধ্যে তীরন্দাজী প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করেছেন। পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার PYKKA যোজনা প্রারম্ভ করেছেন। এর মাধ্যমে আগামী দিনে সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রামীণ খেলোয়াড়রা নিশ্চিত এগিয়ে যাবে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বনবাসী ক্রীড়া-প্রতিভা বিকশিত হবে বলে মনে হয় না। এর জন্য রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও বিশেষ গ্রামীণ ক্রীড়াপ্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করা উচিত বলে মনে করি।

দেশের বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার কাছে আমাদের আগ্রহ, বিশ্বস্তরীয় খেলাগুলিকে দুর্গম বনবাসী ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের যে নিরন্তর সক্রিয় প্রয়াস করে যাচ্ছে তার অন্তর্গত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে দক্ষ ক্রীড়াপ্রশিক্ষক প্রেরণ করে যোগ্য সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের চয়ন করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে। আমরা তো কেবল বনবাসীর মনে খেলার প্রতি আগ্রহ, ঔৎসুক্য নির্মাণ করেছি। তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা আবশ্যক, ভারতীয় খেল প্রাধিকরণের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন।

শব্দরূপ-৫৭৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

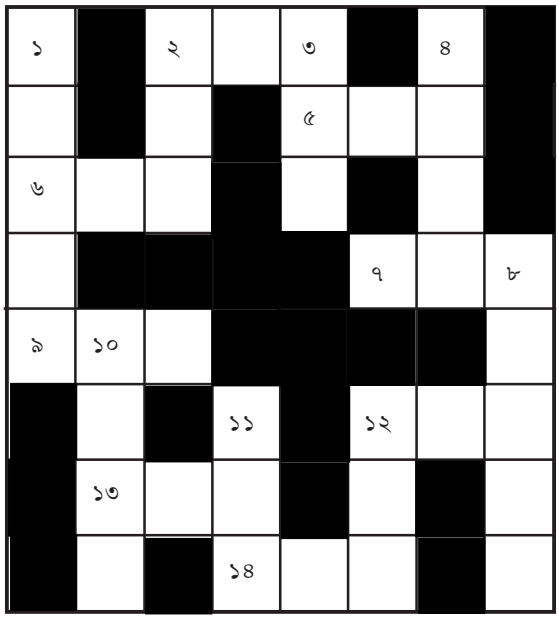

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য **৫.** জানালা, **৬.** রসিকা, **৭.** হায়দ্রাবাদের রাজার উপাধি, **৯.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম জননী, **১২.** সমবয়সী বন্ধু, সখা, **১৩.** আলখাল্লা, প্রথম দু'য়ে হুড়কা বা কীলক, **১৪.** রাধিকার সখী বিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ১. পারদগন্ধক ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ, মীনকেতন, **২.** রাধিকার ননদ কুটিলার জননী, **৩.** সূর্যবংশীয় বাহু রাজার পুত্র, বিষযুক্ত, **৪.** বালী ও সুগ্রীবের মা-ও বটে, আবার বাবাও বটে, প্রথম দু'য়ে ভল্লুক, **৮.** ব্যাসজননী, শান্তনু রাজমহিষী, **১০.** পুরাণোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিবিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার) **১১.** ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া, **১২.** যোগলব্ধ ঐশ্বর্য বিশেষ, বশ করিবার শক্তি।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৭৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
রজত দাস
দিনহাটা,
কোচবিহার

■	■	উ	ভ	য়	ভা	র	তী
ম	লি	দা	■	■	■	জ	■
চ্ছ	■	রা	জ্য	শ্রী	■	ত	■
ব	পু	■	■	ল	■	গি	■
■	ণ্ড	■	পু	■	■	রি	পু
■	রী	■	কি	রা	ত	■	রী
■	কা	■	■	■	ন	হু	ষ
অ	ক্ষ	য়	তৃ	তী	য়া	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৭৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ মে, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১

চিত্রকথা–র এবারের বিষয় 'সর্প যজ্ঞ'। এই চিত্রকথাটি আপনাদের কাছে আকর্ষক হবে বলে আশা রাখি। —স্বঃ সঃ

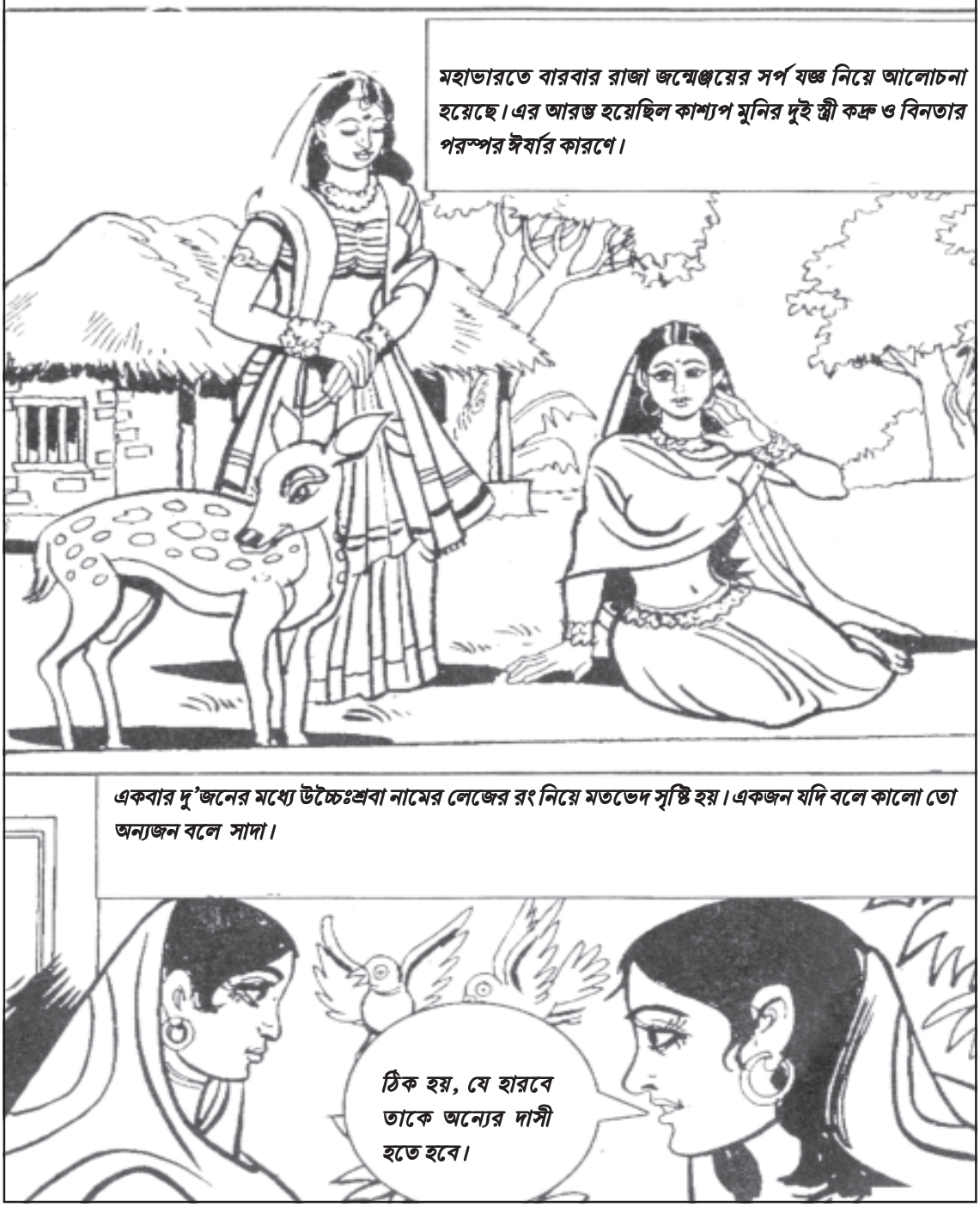

Swastika RNI No. 5257/57
25 April - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

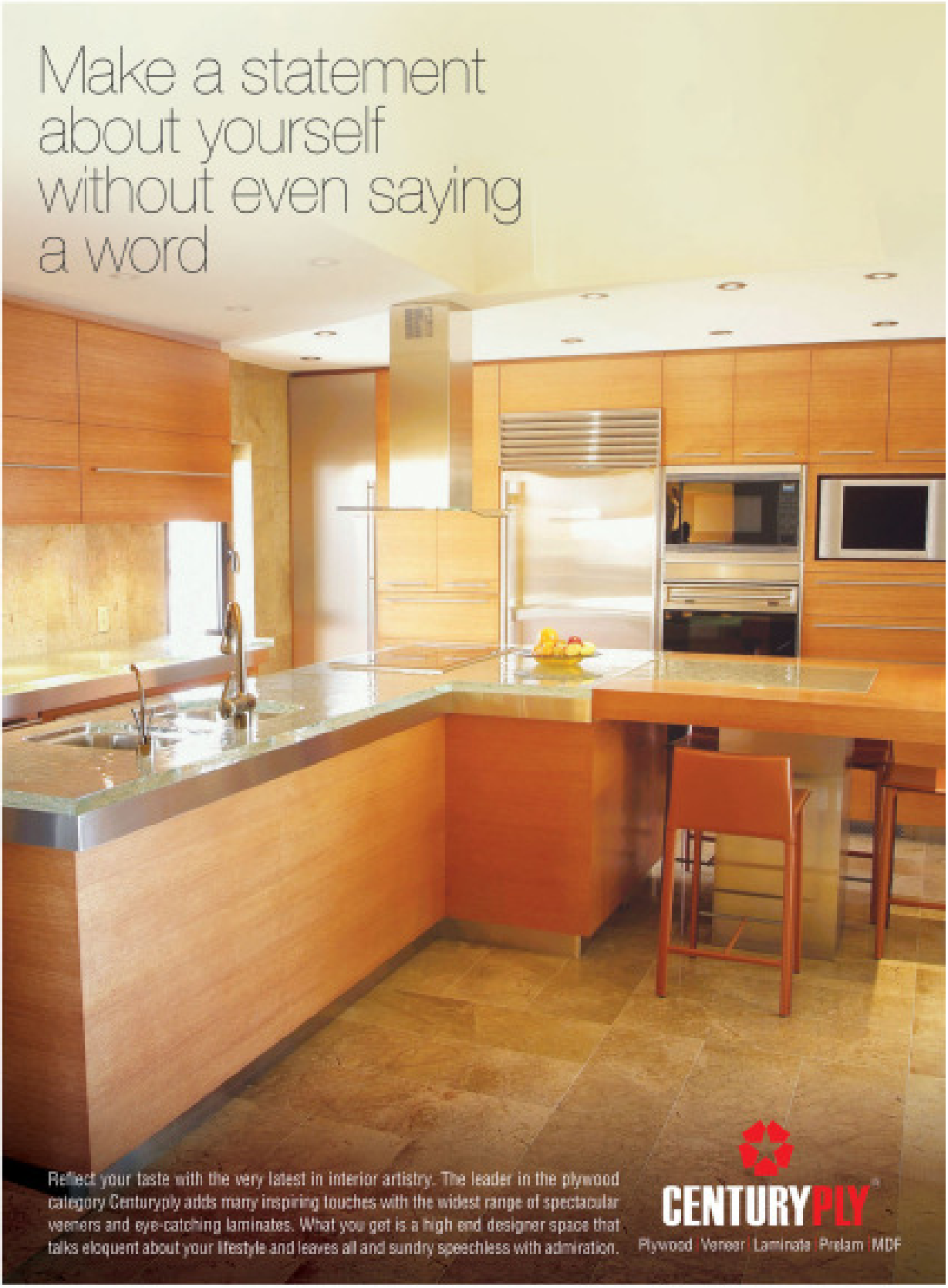

দাম : ৫.০০ টাকা